আধুনিক বাংলা কবিতা

আধুনিক বাংলা কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

সম্পাদিত

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ১২

প্রকাশক : শ্রী সুপ্রিয় সরকার
এম সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৪৬, জুলাই ১৯৪০

*　　　*　　　*

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত প্রথম সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৬০, মার্চ ১৯৫৪
বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৬২, মার্চ ১৯৫৬
বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৬৬, জুলাই ১৯৫৯
বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণ . ভাদ্র ১৩৭০, আগস্ট ১৯৬৩

মূল্য : ছয় টাকা

মুদ্রক : শ্রী গোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

ভূমিকা

বাংলা কবিতা রূপে-রসে উজ্জ্বল ও বিচিত্র, পরিমাণেও প্রচুর, অথচ সেই তুলনায় সংকলনগ্রন্থ যথেষ্ট নেই। গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে যে-ক'টি বেরিয়েছে, বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা অথবা বৈবাহিক উপহার লক্ষ্য করার জন্য তারা সাহিত্যিকের পক্ষে তৃপ্তিকর হ'তে পারেনি। বাংলা বইয়ের কাটতির এই সুপারিশ দুটি এড়িয়ে গিয়ে শুধু আনন্দের জন্যই কাব্যচয়নে প্রবৃত্ত হবার প্রয়োজন আছে। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সেই ধরনের প্রথম প্রচেষ্টা, বলা যায়।

এই বইয়ের পরিকল্পনা আমার মনে জেগে ওঠে আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনার ফলে, এবং সহৃদয় প্রকাশকের সহযোগিতায়, কল্পনাটিকে বাস্তবে পরিণত করা অসম্ভব হয়নি। সেবারে সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন দু-জন রসজ্ঞ সমালোচক; তাঁদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও মেলবার মতো জায়গা প্রশস্ত ছিলো ব'লে বইখানার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়নি। এবারে সম্পাদনা করতে হ'লো আমাকে। কোনো পাঠক দুটি সংস্করণের তুলনা ক'রে দেখলে সহজেই বুঝতে পারবেন, পূর্ববর্তী সম্পাদকদের সঙ্গে কোথায় আমার রুচিব প্রভেদ।

কিন্তু প্রভেদটা একান্তভাবে রুচিবৈষম্যের জন্যই ঘটেছে, তাও নয়। মধ্যবর্তী বছরগুলিতে পুরোনো কবিদের অনেক নতুন লেখা বেরিয়েছে, অনেক নতুন কবি দেখা দিয়েছেন। সেই কারণে পরিবর্তনের অনিবার্য প্রয়োজন ছিলো। তা ছাড়া, পূর্ববর্তী সম্পাদকেরা আধুনিকতার বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ স্থির ক'রে নিয়েছিলেন; সামাজিক বিষয়, বিতর্ক, ব্যঙ্গ, মননধর্মিতা, নূতনতর ভবিষ্যতের দিকে উন্মুখতা, এই রকম কয়েকটি চিহ্নের সাহায্যে এঁরা যাচাই এবং বাছাই করেছিলেন। বাংলা কবিতায় এই লক্ষণগুলো সদ্য দেখা দিয়েছে সেই সময়ে, তখনকার মতো ঐ দিকেই বিশেষভাবে ঝোঁক পড়া অস্বাভাবিক ছিলো না। কিন্তু এর ফলে অন্য দিকে অসম্পূর্ণতা ঘ'টে গেলো, গীতধর্মিতার স্থান হ'লো সংকুচিত; চিত্রকল্পপ্রধান কবিতা, আবেগপ্রবণ কবিতা উপযুক্ত মর্যাদা পেলো না। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এই যে আধুনিক বাংলা কবিতা এই দুই দিকেই সক্রিয় এবং উল্লেখযোগ্য; আর আমার সৌভাগ্য এই যে উভয় ক্ষেত্রেই আমার আনন্দ অবার। সুধীন্দ্রনাথের মনীষিতায় আমার

মন যেমন সাড়া দেয়, জীবনানন্দর দৃশ্যগন্ধময় নির্জন কান্তারেও আমি তেমনি আনন্দে বিচরণ করি; বিষ্ণু দে-র অল্প বয়সের অল্প-বলার চাতুরী আমাকে যেমন মুগ্ধ করে, তেমনি আমি কান পেতে শুনতে চাই অমিয় চক্রবর্তীর নিচু গলার হার্দ্য উচ্চারণ। এইজন্য আমার পক্ষে উভয় দিকের সমতা রক্ষা করা শক্ত হয়নি; কোথাও-কোথাও কবিতার নির্বাচনে এত বেশি অদল-বদল করতে হয়েছে যে অংশত এটিকে প্রায় নতুন বই বলা যায়।

সকলের রুচি একরকম নয়, ব্যক্তিগত পক্ষপাতও সকলেরই আছে, তবু আমি পাঠককে অনুরোধ করি আধুনিক কবিতার কোনো-একটি বিশেষ অংশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না-ক'রে ব্যাপারটাকে সমগ্রভাবে দেখতে। কোনো-একটা 'যুগ' বা 'আন্দোলনে'র চরিত্রলক্ষণ এক কথায় ব'লে দেয়া অসম্ভব, চারদিক থেকে আলো ফেললে তবেই তার চেহারাটি ফুটে বেরোয়। উদাহরণত, য়োরোপের উনিশ-শতকী রোমান্টিক আন্দোলনের দশটি সংজ্ঞার্থ যদি উদ্ধৃত করা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে তার অনেকগুলোই পরস্পরবিরোধী, কোনোটি প্রশংসায় প্রদীপ্ত, কোনোটি আক্রমণে প্রখর, অথচ প্রত্যেকটিকেই আংশিকভাবে সত্য ব'লে স্বীকার না-ক'রে উপায় নেই; রোমান্টিক বেদনার তাৎপর্য বুঝতে হ'লে সবগুলোকেই একসঙ্গে স্মরণে রাখা প্রয়োজন। আরো উল্লেখ্য এই, যে-কবি 'ভেরটেরের দুঃখ' লিখে সারা য়োরোপকে অশ্রুপ্লাবনে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তিনিই রোমান্টিকতাকে অভিহিত করেছিলেন 'রুগ্নতা' ব'লে। একজন প্রতিভাবান মানুষের মধ্যেই যখন যে এই রকম আত্মবিরোধ সম্ভব, তখন কোনো সমগ্র যুগের সৃষ্টির বেগে যে স্রোতের তলায় অনেক আবর্ত থাকবে তা বোধহয় বলা বাহুল্য। সাহিত্য জিনিশটা মানুষের চিত্তের নির্যাস, আর মনের মহিমা এখানেই যে সে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে না; অনেক বিরোধ, ব্যতিক্রম, অসংগতির মধ্য দিয়েই তার প্রকাশের পথ এঁকে-বেঁকে চলতে থাকে। এইজন্য সাহিত্যকে যে-কোনো রকম ফর্মূলার মধ্যে বাঁধতে গেলে বোধের বিকৃতি অনিবার্য হ'য়ে পড়ে।

বাংলা ভাষার আধুনিক কবিতার সমগ্র রূপটিকে দেখবার পক্ষে যাতে সাহায্য হয়, এই গ্রন্থসংকলনে মনে-মনে আমি তা-ই ইচ্ছে করেছি। অবশ্য 'সমগ্র' বললে বড্ড বেশি বলা হ'য়ে যায়: ছোটো নৌকোয় ইচ্ছেমতো যাত্রী তুলতে পারিনি; আমি যেমন নির্বাচন করতে গিয়ে

বার-বার লোভে দ্বিধায় কম্পমান হয়েছি, তেমনি অনেক পাঠকও নিশ্চয়ই নালিশ জানাবেন তাঁর বিশেষ প্রিয় কোনো-কোনো কবিতা নেই ব'লে। তবু অন্তত এটুকু বলা যায় যে গত পঁচিশ বা তিরিশ বছরের বাংলা কবিতার মোটামুটি পরিচয় থাকলো এখানে, অন্তত আগ্রহ জাগাবার পক্ষে, আনন্দ পাবার পক্ষে, ফিরে-ফিরে পড়ার এবং ভাবার পক্ষে যথেষ্ট। নিশ্চয়ই এই বইয়ের ভাগ্যে এমন পাঠকও জুটবে, যিনি এটুকু পরিচয়েই তৃপ্ত হবেন; আর যদি কারো মনে আরো নিবিড় ও বিস্তারিতভাবে জানবার জন্য আগ্রহ জেগে ওঠে তাহ'লে আমার শ্রম আরো সার্থক হবে। কিন্তু কিছুটা অসতর্কভাবে পাতা উল্টিয়ে গেলেও আশা করি এটুকু চোখে পড়বে যে আমাদের সাম্প্রতিক কবিরা কত বিচিত্রভাবে সৃষ্টিশীল। এই বৈচিত্র্যের উপর আমি একটু জোর দিতে চাই, কেননা এর মূল্য শুধু অলংকার হিশেবে বা স্বাদ-বদলের তাগিদে নয়, প্রাণের ঐশ্বর্যের নামই বৈচিত্র্য। সকলেই জানেন, সমকালীন এবং ঐতিহাসিক অর্থে একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত কবিদের মধ্যেও ব্যক্তিস্বরূপের বৈশিষ্ট্যগত প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়, সে-প্রভেদ কখনো বা এতই বৃহৎ যে ঐতিহাসিক সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়াও সহজ হয় না। সকলেই জানেন, কিন্তু সকলেই এ-কথা মেনে নিয়ে সুখী হ'তে পারেন না; সমালোচকের চেষ্টা থাকে একই ছকের মধ্যে সকলকে মানিয়ে নিতে, তার জন্য কোনো-কোনো কবিকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে দুমড়িয়ে নিতে—বা উপেক্ষা করতেও—অনেক সময় তাঁদের বিবেকে বাধে না। সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে বসলে ও-রকম কোনো শৃঙ্খল বা শৃঙ্খলা হয়তো মেনে নিতেই হয়, কিন্তু যে-ভাগ্যবান পাঠকের ও-সব বালাই নেই, যাঁকে ক্লাশ পড়াতেও হবে না, পরীক্ষা পাশ করতেও হবে না, তিনি প্রত্যেক কবির বৈশিষ্ট্যের দিকটাই স্বতন্ত্রভাবে উপভোগ করতে পারেন—যদি তাঁর মনে সংবেদনশীলতার অভাব না থাকে। ওঅর্ডস্বার্থের সঙ্গে কীটসের প্রায় কিছুই মেলে না, তার চেয়েও কম মেলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী, অথচ জন্মক্ষণের সামীপ্য ছাড়া আর কোন কারণে তাঁরা একই আন্দোলনের অন্তর্ভূত হলেন, তা নিয়ে সমালোচক নিশ্চয়ই চিন্তা করবেন, কিন্তু কোনো পাঠক যদি উভয়ের কবিতাই আনন্দের সঙ্গে প'ড়ে উঠতে পারেন, আমি বলবো সেটুকুই সাচ্চা লাভ। আধুনিক বাংলা কবিতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা যেন সবিস্ময়ে এই কথাটা উপলব্ধি

করি যে ঐক্যের মধ্যেও বিপরীতের স্থান আছে, বিরোধের মধ্যেও সংহতির সম্ভাবনা।

অর্থাৎ, এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে কোনো-একটা চিহ্নদ্বারা অবিকলভাবে শনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা ও বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম ও আধ্যাত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে, শুধু ভিন্ন-ভিন্ন কবিতে নয়, কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়। উপরন্তু, এর একটি বড়ো অংশ জুড়ে আছে প্রেমের কবিতা আর প্রকৃতির কবিতা; সেই প্রেমের আরক্ত সংরাগ যেমন বাংলা কবিতার সাহসের সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে, তেমনি প্রকৃতিও অন্য রকম অর্থ পেয়েছে কখনো বা রূপকথায় রূপান্তরিত হ'য়ে, কখনো বা নাগরিক অথবা বৈদেশিক জীবনের পটভূমিকায়। অনেকেই বলেছেন যে 'বন্দীর বন্দনা' বইটা বিদ্রোহের কাব্য, সেইজন্য উল্লেখ করছি যে রচনাকালের দিক থেকে ঐ বইয়েরই সহযাত্রী 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাগুচ্ছ—যেখানে বিদ্রোহের আভাস-মাত্র নেই, আছে স্বপ্নের হাতে আত্মসমর্পণের আকূতি। যে-সময়ে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর নাস্তিকতার নান্দীপাঠ আরম্ভ করলেন, ঠিক সেই সময়েই অমিয় চক্রবর্তীর মুখে বিশ্বাসের নতুন অঙ্গীকার শুনতে পেলাম আমরা—'মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়িটার ঐ ভাঙা দরজাটা মেলাবেন।' যখন সমর সেনের আপাত-রোমান্টিকবিরোধী কবিতা লুপ্ত রোমান্টিক সৌন্দর্যের জন্য হাহাকারে ভ'রে উঠছে, তারই অল্প পরে সুভাষ মুখোপাধ্যায় উচ্চহাসির হাওয়া তুলে সেটাকে উড়িয়ে দিলেন বিষাদেরও অযোগ্য ব'লে। এমনকি, বিষ্ণু দে আর সুধীন্দ্রনাথের নাম অনেকেই যদিও একসঙ্গে উচ্চারণ ক'রে থাকেন, আসলে, এঁরাও কোনো অর্থেই এক জগতের অধিবাসী নন; 'চোরাবালি'র ঝকঝকে হালকা চালের সঙ্গে 'অর্কেস্ট্রা'র নিবিড় গভীর বাক্য-বন্ধের কিছুই সাদৃশ্য নেই, আর এ-দু'জনের ধ্যান-ধারণায় মৌলিক ব্যবধানও ক্রমশই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। অতএব এই কবিদের মধ্যে সামান্য লক্ষণ কোনটা তার আভাস দিতে যাওয়াও তর্কসাপেক্ষ। কোনো-একটা

সূক্ষ্ম গ্রন্থি আছে তাতে সন্দেহ নেই, সেটাকে অনুভব করা যায়, কিন্তু তার কোনো নাম দিতে গেলেই উল্টো দিকে অনেক সাক্ষী দাঁড়িয়ে যাবে। সেই শওয়াল-জবাবের জটিলতার মধ্যে এই গ্রন্থের পাঠককে টেনে নিয়ে যেতে চাই না। সহজ দৃষ্টিতে যেটুকু চোখে পড়ে তা এই : এই কবিরা নতুন স্বর এনেছেন আমাদের কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের পরে নতুন স্বর, রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন স্বর। এঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, এবং স্বতন্ত্রভাবে নতুন। এই কথার অর্থ অনেকখানি।

কিন্তু—কোনো পাঠক হয়তো মনে-মনে বলছেন—রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই। সে-কথাও সত্য, তাই এই সংকলন আরম্ভ হয়েছে 'লিপিকা'র রচনা দিয়ে, যে-বইতে, 'মানসী' থেকে 'বলাকা' পর্যন্ত এক জন্ম শেষ ক'রে, রবীন্দ্রনাথ নতুন ক'রে জন্মেছিলেন। তাঁর শেষ পর্যায়ের রচনার ধারা আমাদের সাম্প্রতিক কাব্যে নানা ভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে; পরবর্তীর প্রতিবেশিতায় সেই সম্বন্ধটি চিনতে পারা হয়তো সহজ হবে। পূর্ববর্তীদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী আর অবনীন্দ্রনাথের সংযোজনায় আমি বিশেষ তৃপ্তি পেয়েছি; পদ্যরচনায় প্রমথ চৌধুরীর কারুকর্ম বিস্মরণযোগ্য নয়, আর অবনীন্দ্রনাথের গদ্যই যে কবিতা, তার একটা চাক্ষুষ প্রমাণ উপস্থিত করার প্রয়োজন ছিলো ব'লে মনে করি। তরুণতর কবিদের দিকেও পাঠকের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করতে চাই; তাঁদের প্রতিশ্রুতি সংশয়াতীত, ভালো কবিতার সংখ্যাও কম নয়, এবং স্থানাভাববশত এই সংকলন থেকে যাঁরা বাদ পড়লেন, কিংবা যাঁদের লেখা সবেমাত্র প্রকাশিত হচ্ছে, তাঁরাও অনেকে মনোযোগের অযোগ্য নন। আরো সুখের কথা, এই অতি তরুণ কবিদের মধ্যে কেউ-কেউ পূর্ববাংলার অধিবাসী; বাংলাদেশ বিভক্ত হ'য়েও যদি এখনো কোথাও এক হ'তে পারে, সে এই সাহিত্যের ক্ষেত্রেই।

সংকলনকর্মে আমাকে অবিরলভাবে সাহায্য করেছেন তরুণ কবি শ্রী অরুণকুমার সরকার; তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই বইয়ের যেটুকু ভালো তার কৃতিত্বে তাঁরও অংশ আছে, কিন্তু দোষত্রুটিগুলোর দায়িত্ব সম্পূর্ণই আমার।

যে-সব লেখক, প্রকাশক ও লেখকের স্বত্বাধিকারী কবিতার পুনর্মুদ্রণের জন্য অনুমতি দিয়েছেন, তাঁদের সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

নভেম্বর, ১৯৫৩ বু. ব.

'আধুনিক বাংলা কবিতা'র এই নতুন সংস্করণে বহু পরিবর্তন করা হ'লো; ছয়জন কবি সংযোজিত হলেন, এবং কোনো-কোনো পুরোনো কবি—সম্প্রতি যাঁদের অনেক লেখা বেরিয়েছে—তাঁদের রচনা নতুন ক'রে নির্বাচন করলাম। আগের বারে ৪৯জন কবির ১৭৬টি কবিতার বদলে এবার স্থান পেলো ৫৫ জন কবির ১৯৬টি কবিতা; অথচ মুদ্রণের পারিপাট্যের জন্য পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ্যভাবে বাড়লো না, দামও প্রায় একই থাকলো। গত সংস্করণে বহু অমার্জনীয় ছাপার ভুল ঘটেছিলো; এবারে তার সংশোধনের সুযোগে তৃপ্তি পেলাম; কবিতাগুলোর পাঠ প্রকাশিত গ্রন্থ বা পত্রিকার সঙ্গে যথাসম্ভব মিলিয়ে দেয়া হ'লো, এবং একই কবির বিভিন্ন কবিতাও রচনার বা প্রকাশের তারিখ অনুসারে বিন্যস্ত ক'রে দিলাম। আধুনিক বানানের কয়েকটি মূল সূত্র সর্বত্রই প্রয়োগ করা হয়েছে; কিন্তু 'হ'লো', 'এসেছো' প্রভৃতি বিকল্পবহুল শব্দে সংগতিরক্ষার চেষ্টা না-ক'রে বিভিন্ন কবির অভ্যাসকেই স্বীকার ক'রে নিয়েছি। প্রথম প্রকাশের পর, বা এই গ্রন্থের গত সংস্করণের পরেও, কবিরা তাঁদের রচনায় যে-সব পাঠ-পরিবর্তন করেছেন, সেগুলো, অনেক সময় আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও, অঙ্গীকার ক'রে নিলাম।

এই সংস্করণের সম্পাদনায় আমাকে মূল্যবান সাহায্য করেছেন শ্রী নরেশ গুহ; এ-জন্য, এবং অন্য অনেক সহযোগের জন্য, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ আছি। পরিশেষে উল্লেখ করি, আমার দুই কন্যা শ্রীমতী মীনাক্ষী ও দময়ন্তী বসুর নিরন্তর সাহায্য না-পেলে এই সম্পাদনকর্ম সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'তো না।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ বু. ব.

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে জীবনানন্দ দাশের দুটি কবিতা ('বোধ', 'আদিম দেবতারা') যোগ করা হ'লো, কিন্তু প্রকাশের কালক্রম অনুসারে কবিতা দুটিকে যথাস্থানে বিন্যস্ত করা সম্ভব হয়নি। অভিজ্ঞ পাঠককে ব'লে দিতে হবে না যে 'বোধ' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-পর্যায়ের রচনা, আর 'আদিম দেবতারা' কবির মধ্য পযায়ের।

দু-জন নতুন কবি এই সংস্করণে অন্তর্ভূক্ত হলেন। বানান বিষয়ে অধিকতর সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করেছি।

জুলাই, ১৯৫৯ বু. ব

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

'আধুনিক বাংলা কবিতা'য় এ-যাবৎ নজরুল ইসলামের যে-পাঁচটি কবিতা সংকলিত ছিলো, তার মধ্যে চারটিকে এবারে বর্জন করতে বাধ্য হলাম। এর কারণ সাহিত্যিক নয়, আইনগত ; অর্থাৎ, যিনি বা যাঁরা ঐ সব কবিতার স্বত্বাধিকারী, তাঁদের কাছ থেকে, বহু প্রয়াস ও অনুনয় সত্ত্বেও, পুনর্মুদ্রণের অনুমতি এ-মুহূর্তে পাওয়া গেলো না। পূর্ববর্তী কোনো সংস্করণে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি ব'লে, এবারে তাঁদের অসহযোগ আমার পক্ষে কল্পনাতীত ছিলো। কিন্তু অনেকগুলি সপ্তাহ অপেক্ষায় ও উৎকণ্ঠায় কাটাবার পরেও যখন স্বত্বাধিকারী বা তাঁর প্রতিনিধিবর্গ কোনো স্পষ্ট জবাব দিলেন না, তখন অগত্যা নজরুলের অন্য কবিতা দিয়ে, বইখানাকে বের ক'রে দেয়াই ভালো মনে করলাম। নজরুলের সংকলনে এই পরিবর্তন ঘটাতে পাঠকের ক্ষুব্ধ হবার অধিকার আছে—কিন্তু আমার বেদনা আরো বড়ো, আশা করি আমার নিরুপায় অবস্থা বুঝে পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন। সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে পূর্ব-ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনবো।

এই সংস্করণে যাঁদের কবিতার সংখ্যা বাড়ানো হ'লো, তাঁরা হলেন —মোহিতলাল মজুমদার, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অরুণকুমার সরকার, নরেশ গুহ ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

জুলাই ১৯৬৩ বু. ব.
কলকাতা

সূচিপত্র

আধুনিক বাংলা কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

১. সন্ধ্যা ও প্রভাত

এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন দেশে, কোন সমুদ্র পারে, তোমার প্রভাত হল।

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো; কোনখানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা।

জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।

এখানে একে-একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জানলা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।

ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে, পুবের দিকে মুখ ক'রে চলেছে; ওদের কপালে লেগেছে সকালের আলো, ওদের পারানির কড়ি এখনো ফুরোয় নি; ওদের জন্যে পথের ধারের জানলায়-জানলায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষ চেয়ে আছে; রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরলে, বললে, "তোমাদের জন্যে সব প্রস্তুত।" ওদের হৃৎপিণ্ডের রক্তের তালে-তালে জয়ভেরী বেজে উঠল।

এখানে সবাই ধূসর আলোয় দিনের শেষ খেয়া পার হল।

পান্থশালায় আঙিনায় এরা কাঁথা বিছিয়েছে; কেউ বা একলা, কারো বা সঙ্গী ক্লান্ত; সামনের পথে কী আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কী ছিল কানে-কানে বলাবলি করছে; বলতে-বলতে কথা বেধে যায়, তার পরে চুপ ক'রে থাকে; তার পরে আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে, আকাশে উঠেছে সপ্তর্ষি।

সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ ক'রে চ'লে যাক।

২. একটি দিন

মনে পড়ছে সেই দুপুরবেলাটি। ক্ষণে-ক্ষণে বৃষ্টিধারা ক্লান্ত হ'য়ে আসে, আবার দমকা হাওয়া তাকে মাতিয়ে তোলে।

ঘরে অন্ধকার, কাজে মন যায় না। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বর্ষার গানে মল্লারের সুর লাগালেম।

পাশের ঘর থেকে একবার সে কেবল দুয়ার পর্যন্ত এল। আবার ফিরে গেল। আবার একবার বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পরে ধীরে ধীরে ভিতরে এসে বসল। হাতে তার সেলাইয়ের কাজ ছিল, মাথা নিচু ক'রে সেলাই করতে লাগল। তার পরে সেলাই বন্ধ ক'রে জানলার বাইরে ঝাপসা গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

বৃষ্টি ধ'রে এল, আমার গান থামল। সে উঠে চুল বাঁধতে গেল।

এইটুকু ছাড়া আর কিছুই না। বৃষ্টিতে গানেতে অকাজে আঁধারে জড়ানো কেবল সেই একটি দুপুরবেলা।

ইতিহাসে রাজাবাদশার কথা, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী, শস্তা হ'য়ে ছড়াছড়ি যায়। কিন্তু, একটি দুপুরবেলার ছোটো একটু কথার টুকরো দুর্লভ রত্নের মতো কালের কৌটোর মধ্যে লুকোনো রইল, দুটি লোক তার খবর জানে।

৩. পূর্ণতা

১

স্তব্ধরাতে একদিন
নিদ্রাহীন
আবেগের আন্দোলনে তুমি
বলেছিলে নতশিরে
অশ্রুনীরে
ধীরে মোর করতল চুমি—
"তুমি দূরে যাও যদি,
নিরবধি
শূন্যতার সীমাশূন্য ভারে

সমস্ত ভুবন মম
মরুসম
রুক্ষ হ'য়ে যাবে একেবারে।
আকাশ-বিস্তীর্ণ ক্লান্তি
সব শান্তি
চিত্ত হ'তে করিবে হরণ,—
নিরানন্দ নিরালোক
স্তব্ধ শোক
মরণের অধিক মরণ॥"

২

শুনে, তোর মুখখানি
বক্ষে আনি
বলেছিনু তোরে কানে-কানে,—
"তুই যদি যাস দূরে
তোরি সুরে
বেদনা-বিদ্যুৎ গানে-গানে
ঝলিয়া উঠিবে নিত্য,
মোর চিত্ত
সচকিবে আলোকে-আলোকে।
বিরহ, বিচিত্র খেলা
সারা বেলা
পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।
তুমি খুঁজে পাবে প্রিয়ে,
দূরে গিয়ে
মর্মের নিকটতম দ্বার,—
আমার ভুবনে তবে
পূর্ণ হবে
তোমার চরম অধিকার॥"

৩

দুজনের সেই বাণী
কানাকানি,
শুনেছিল সপ্তর্ষির তারা ;
রজনীগন্ধার বনে
ক্ষণে-ক্ষণে
ব'হে গেল সে-বাণীর ধারা।
তার পরে চুপে-চুপে
মৃত্যুরূপে
মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার।
দেখাশুনা হ'ল সারা,
স্পর্শহারা
সে-অনন্তে বাক্য নাহি আর।
তবু শূন্য শূন্য নয়,
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে-গগন।
একা-একা সে-অগ্নিতে
দীপ্ত গীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন॥

৪. অচেনা

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী ক'রে
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে ?
কোন অন্ধক্ষণে
বিজড়িত তন্দ্রাজাগরণে
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর,
মুখ দেখিলাম তোর।

চক্ষু-'পরে চক্ষু রাখি শুধালেম, 'কোথা সংগোপনে
আছ আত্মবিস্মৃতির কোণে?'

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না,
কানে-কানে মৃদু কণ্ঠে নয়।
ক'রে নেব জয়
সংশয়কুণ্ঠিত তোর বাণী;
দৃপ্ত বলে লব টানি
শঙ্কা হ'তে লজ্জা হ'তে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব হ'তে
নির্দয় আলোতে।
জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্তে চিনিবি আপনারে;
ছিন্ন হবে ডোর,
তোমার মুক্তিতে তবে মুক্তি হবে মোর

হে অচেনা,
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় রবে না,
মহা আকস্মিক
বাধাবন্ধ ছিন্ন করি দিক,
তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জ্বলি,
দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।

৫. প্রশ্ন

ভগবান, তুমি যুগে-যুগে দূত পাঠায়েছ বারে-বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা ব'লে গেল "ক্ষমা করো সবে", ব'লে গেল "ভালোবাসো—
অন্তর হ'তে বিদ্বেষ-বিষ নাশো।"

বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।
আমি-যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি-যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি-যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হ'য়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো

৬. বিস্ময়

আবার জাগিনু আমি।
রাত্রি হ'ল ক্ষয়।
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব।
এই তো বিস্ময়
অন্তহীন।
ডুবে গেছে কত মহাদেশ,
নিবে গেছে কত তারা,
হয়েছে নিঃশেষ
কত যুগ যুগান্তর।
বিশ্বজয়ী বীর
নিজেরে বিলুপ্ত করি শুধু কাহিনীর
বাক্যপ্রান্তে আছে ছায়াপ্রায়।

কত জাতি
কীর্তিস্তম্ভ রক্তপঙ্কে তুলেছিল গাঁথি
মিটাতে ধূলির মহাক্ষুধা।
সে-বিরাট
ধ্বংসধারা মাঝে আজি আমার ললাট
পেল অরুণের টিকা আরো একদিন
নিদ্রাশেষে,
এই তো বিস্ময় অন্তহীন।

আজ আমি নিখিলের জ্যোতিষ্ক-সভাতে
রয়েছি দাঁড়ায়ে।
আছি হিমাদ্রির সাথে,
আছি সপ্তর্ষির সাথে,
আছি যেথা সমুদ্রের
তরঙ্গে ভঙ্গিয়া উঠে উন্মত্ত রুদ্রের
অট্টহাস্যে নাট্যলীলা।
এ-বনস্পতির
বল্কলে স্বাক্ষর আছে বহু শতাব্দীর,
কত রাজমুকুটেরে দেখিল খসিতে।—
তারি ছায়াতলে আমি পেয়েছি বসিতে
আরো একদিন—
জানি এ-দিনের মাঝে
কালের অদৃশ্য চক্র শব্দহীন বাজে।

৭. বাঁশি

কিনু গোয়ালার গলি।
দোতলা বাড়ির
লোহার গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।

লোনা-ধরা দেয়ালেতে মাঝে-মাঝে ধ'সে গেছে বালি,
মাঝে-মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।
মার্কিন থাকের মার্কা একখানা ছবি
সিদ্ধিদাতা গণেশের
দরজার 'পরে আঁটা।
আমি ছাড়া ঘরে থাকে আরেকটা জীব
এক ভাড়াতেই,
সেটা টিকটিকি।
তফাৎ আমার সঙ্গে এই শুধু,
নেই তার অন্নের অভাব ॥
বেতন পঁচিশ টাকা,
সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি।
খেতে পাই দত্তদের বাড়ি
ছেলেকে পড়িয়ে।
শেয়ালদা ইস্টিশনে যাই,
সন্ধেটা কাটিয়ে আসি,
আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে।
এঞ্জিনের ধস্‌-ধস্‌,
বাঁশির আওয়াজ,
যাত্রীর ব্যস্ততা,
কুলি হাঁকাহাঁকি।
সাড়ে দশ বেজে যায়,
তার পরে ঘরে এসে নিরালা নিঃঝুম অন্ধকার।

ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রাম।
তাঁর দেওরের মেয়ে,
অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক।
লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল,—
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।

মেয়েটা তো রক্ষে পেলে,
আমি তথৈবচ।
ঘরেতে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর॥

বর্ষা ঘন ঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে-মাঝে মাইনেও কাটা যায়।
গলিটার কোণে-কোণে
জ'মে ওঠে প'চে ওঠে
আমের খোসা ও আঁটি, কাঁঠালের ভুতি,
মাছের কানকা,
মরা বেড়ালের ছানা,
ছাইপাঁশ আরো কত কী যে।
ছাতার অবস্থাখানা, জরিমানা-দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার।
আপিসের সাজ
গোপীকান্ত গোঁসাইয়ের মনটা যেমন,
সর্বদাই রসসিক্ত থাকে।
বাদলের কালো ছায়া
স্যাঁৎসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে
কলে-পড়া জন্তুর মতন
মূর্ছায় অসাড়।
দিনরাত মনে হয়, কোন আধমরা
জগতের সঙ্গে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা প'ড়ে আছি।

•

গলির মোড়েই থাকে কান্তবাবু,
যত্নে পাট-করা লম্বা চুল,

বড়ো-বড়ো চোখ,
শৌখিন মেজাজ।
কর্নেট বাজানো তার শখ।
মাঝে-মাঝে সুর জেগে ওঠে
এ-গলির বীভৎস বাতাসে
কখনো গভীর রাতে,
ভোরবেলা আধো অন্ধকারে—
কখনো বৈকালে
ঝিকিমিকি আলোয়-ছায়ায়।

হঠাৎ সন্ধ্যায়
সিন্ধু বারোয়াঁয় লাগে তান,
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহবেদনা।
তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে
এ-গলিটা ঘোর মিছে
দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো
হঠাৎ খবর পাই মনে,
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চ'লে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।
এ-গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলি লগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী,
তীরে তমালের ঘন ছায়া,
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা ক'রে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর॥

৮. সাধারণ মেয়ে

আমি অন্তঃপুরের মেয়ে,—
চিনবে না আমাকে।
তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু,
"বাসি ফুলের মালা।"—
তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেশারেশি,—
দেখলেম, তুমি মহদাশয় বটে,
জিতিয়ে দিলে তাকে।

নিজের কথা বলি।
বয়স আমার অল্প
একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।
তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে,—
ভুলে গিয়েছিলেম, অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি।
আমার মতো এমন আছে হাজার-হাজার মেয়ে
অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে।

তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড়ো দুঃখ তার।
তারও স্বভাবের গভীরে
অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও,
কেমন ক'রে প্রমাণ করবে সে,
এমন ক-জন মেলে যারা তা ধরতে পারে।
কাঁচা বয়সের জাদু লাগে ওদের চোখে,

মন যায় না সত্যের খোঁজে,
আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে।

কথাটা কেন উঠল তা বলি।
মনে করো, তার নাম নরেশ।
সে বলেছিল, কেউ তার চোখে পড়েনি আমার মতো।
এত বড়ো কথাটা বিশ্বাস করব যে সাহস হয় না,—
না করব-যে এমন জোর কই।

একদিন সে গেল বিলেতে।
চিঠিপত্র পাই কখনো বা।
মনে-মনে ভাবি, রাম, রাম, এত মেয়েও আছে সে-দেশে,
এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড়।
আর তারা কি সবাই অসামান্য,
এত বুদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা।
আর, তারা সবাই কি আবিষ্কার করেছে এক নরেশ সেনকে
স্বদেশে যার পরিচয় চাপা ছিল দশের মধ্যে।

গেল মেল-এর চিঠিতে লিখেচে
লিজির সঙ্গে গিয়েছিল সমুদ্রে নাইতে।
বাঙালি কবির কবিতা ক-লাইন দিয়েছে তুলে,
সেই যেখানে উর্বশী উঠচে সমুদ্র থেকে।
তার পরে বালির 'পরে বসল পাশাপাশি,—
সামনে দুলচে নীল সমুদ্রের ঢেউ,
আকাশে ছড়ানো নির্মল সূর্যালোক।
লিজি তাকে খুব আস্তে-আস্তে বললে,
"এই সেদিন তুমি এসেচ, দুদিন পরে যাবে চ'লে,
ঝিনুকের দুটি খোলা,
মাঝখানটুকু ভরা থাক

একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে,—
দুর্লভ, মূল্যহীন।"
কথা বলবার কী অসামান্য ভঙ্গি।
সেই সঙ্গে নরেশ লিখেছে,
"কথাগুলি যদি বানানো হয় দোষ কী,
কিন্তু চমৎকার,—
হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়?"
বুঝতেই পারচ,
একটা তুলনার সংকেত ওর চিঠিতে অদৃশ্য কাঁটার মতো
আমার বুকের কাছে বিঁধিয়ে দিয়ে জানায়—
আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে।
মূল্যবানকে পুরো মূল্য চুকিয়ে দিই
এমন ধন নেই আমার হাতে।
ওগো না-হয় তাই হ'ল,
না-হয় ঋণীই রইলেম চিরজীবন।
পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি, শরৎবাবু
নিতান্তই সাধারণ মেয়ের গল্প,—
যে-দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে—
অর্থাৎ সপ্তরথিনীর মার।
বুঝে নিয়েচি আমার কপাল ভেঙেচে,
হার হয়েচে আমার।
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে,
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হ'য়ে,
পড়তে-পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে।
ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।

•

তাকে নাম দিয়ো মালতী।
ঐ নামটা আমার।

ধরা পড়বার ভয় নেই ;
এমন অনেক মালতী আছে বাংলাদেশে,
তারা সবাই সামান্ত মেয়ে,
তারা ফরাসী জর্মান জানে না,
কাঁদতে জানে।
কী ক'রে জিতিয়ে দেবে।
উচ্চ তোমার মন, তোমার লেখনী মহীয়সী।
তুমি হয়তো ওকে নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে,
দুঃখের চরমে, শকুন্তলার মতো।
দয়া কোরো আমাকে।
নেমে এসো আমার সমতলে।
বিছানায় শুয়ে-শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে
দেবতার কাছে যে-অসম্ভব বর মাগি—
সে-বর আমি পাব না,
কিন্তু পায় যেন তোমার নায়িকা।
রাখো না কেন নরেশকে সাত বছর লণ্ডনে,
বারে-বারে ফেল করুক তার পরীক্ষায়,
আদরে থাক আপন উপাসিকামণ্ডলীতে
ইতিমধ্যে মালতী পাশ করুক এম. এ.
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে,
গণিতে হোক প্রথম, তোমার কলমের এক আঁচড়ে।
কিন্তু ঐখানেই যদি থামো
তোমার সাহিত্যসম্রাট নামে পড়বে কলঙ্ক।
আমার দশা যাই হোক,
খাটো কোরো না তোমার কল্পনা।
তুমি তো কৃপণ নও বিধাতার মতো।
মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।
সেখানে যারা জ্ঞানী যারা বিদ্বান যারা বীর,
যারা কবি যারা শিল্পী যারা রাজা,

দল বেঁধে আসুক ওর চারদিকে।
জ্যোতির্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে,
শুধু বিদুষী ব'লে নয়, নারী ব'লে।
ওর মধ্যে যে-বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
ধরা পড়ুক তার রহস্য, মূঢ়ের দেশে নয়,
যে-দেশে আছে সমজদার, আছে দরদী,
আছে ইংরেজ, জর্মান, ফরাসী।
মালতীর সম্মানের জন্য সভা ডাকা হোক না,—
বড়ো-বড়ো নামজাদার সভা।
মনে করা যাক সেখানে বর্ষণ হচ্ছে মুষলধারে চাটুবাক্য,
মাঝখান দিয়ে সে চলেছে অবহেলায়—
ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকো।
ওর চোখ দেখে ওরা করছে কানাকানি,
সবাই বলচে, ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।
(এইখানে জনান্তিকে ব'লে রাখি,
সৃষ্টিকর্তার প্রসাদ সত্যই আছে আমার চোখে।
বলতে হ'লো নিজের মুখেই,
এখনো কোনো য়ুরোপীয় রসজ্ঞের
সাক্ষাৎ ঘটেনি কপালে।)
নরেশ এসে দাঁড়াক সেই কোণে,
আর তার সেই অসামান্য মেয়ের দল।
আর, তার পরে ?
তার পরে আমার নটে শাকটি মুড়োলো,
স্বপ্ন আমার ফুরোলো।
হায় রে সামান্য মেয়ে
হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়॥

৯. শিশুতীর্থ

রাত কত হ'লো ?
উত্তর মেলে না।
কেননা, অন্ধ কাল যুগ-যুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে,
পথ অজানা,
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো ;
স্তূপে-স্তূপে মেঘ আকাশের বুকে চেপে ধরেছে ;
পুঞ্জ-পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন
মনে হয় নিশীথ রাত্রের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ;
দিগন্তে একটা আগ্নেয় উগ্রতা
ক্ষণে-ক্ষণে জ্বলে আর নেভে ;
ও কি কোনো অজানা দুষ্টগ্রহের চোখ-রাঙানি,
ও কি কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা।
বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,
অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট ;
তারা অমিতাচারী দৃপ্ত প্রতাপের ভগ্ন তোরণ,
লুপ্ত নদীর বিস্মৃতবিলগ্ন জীর্ণ সেতু,
দেবতাহীন দেউলের সর্পবিবরছিদ্রিত বেদী,
অসমাপ্ত দীর্ণ সোপানপংক্তি শূন্যতায় অবসিত।
অকস্মাৎ উচ্চণ্ড কলরব আকাশে আবর্তিত আলোড়িত হ'তে থাকে,
ও কি বন্দী বন্যা-বারির গুহাবিদারণের রলরোল ?
ও কি ঘূর্ণ্যতাণ্ডবী উন্মাদ সাধকের রুদ্র মন্ত্র উচ্চারণ ?
ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয়-নিনাদ ?
এই ভীষণ কোলাহলের তলে-তলে একটা অস্ফুট ধ্বনিধারা বিসর্পিত—
যেন অগ্নিগিরিনিঃসৃত গদ্‌গদ-কলমুখর পঙ্কস্রোত ;
তাতে একত্রে মিলেছে পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিত জনশ্রুতি,
অবজ্ঞার কর্কশ হাস্য।

সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো,
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে,
মশালের আলোয় ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো।
কোনো-এক সময়ে অকারণ সন্দেহে কোনো-এক পাগল
তার প্রতিবেশীকে হঠাৎ মারে,
দেখতে-দেখতে নির্বিচার বিবাদ বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে দিকে-দিকে।
কোনো নারী আর্তস্বরে বিলাপ করে,
বলে, হায়-হায়, আমাদের দিশাহারা সন্তান উচ্ছন্ন গেল।
কোনো কামিনী যৌবনমদবিলসিত নগ্ন দেহে অট্টহাস্য করে,
বলে, কিছুতে কিছু আসে যায় না॥

২

ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় ব'সে আছে ভক্ত, তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে ;—
আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত।
মেঘ যখন ঘনীভূত, নিশাচর পাখি চিৎকার-শব্দে যখন উড়ে যায়,
সে বলে, ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান ব'লে জেনো।
ওরা শোনে না, বলে, পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি, বলে, পশুই শাশ্বত ;
বলে, সাধুতা তলে-তলে আত্মপ্রবঞ্চক।
যখন ওরা আঘাত পায়, বিলাপ ক'রে বলে, "ভাই, তুমি কোথায় ?"
উত্তরে শুনতে পায়, "আমি তোমার পাশেই।"
অন্ধকারে দেখতে পায় না, তর্ক করে, "এ বাণী ভয়ার্তের মায়াসৃষ্টি,
আত্মসান্ত্বনার বিড়ম্বনা।"
বলে, "মানুষ চিরদিন কেবল সংগ্রাম করবে,
মরীচিকার অধিকার নিয়ে
হিংসা-কণ্টকিত অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে॥"

৩

মেঘ স'রে গেল।
শুকতারা দেখা দিল পূর্বদিগন্তে,

পৃথিবীর বক্ষ থেকে উঠল আরামের দীর্ঘনিশ্বাস,
পল্লবমর্মর বনপথে-পথে হিল্লোলিত,
পাখি ডাক দিল শাখায়-শাখায়।
ভক্ত বললে, সময় এসেচে।
কিসের সময় ?
যাত্রার।
ওরা ব'সে ভাবলে।
অর্থ বুঝলে না, আপন-আপন মনের মতো অর্থ বানিয়ে নিলে।
ভোরের স্পর্শ নামল মাটির গভীরে,
বিশ্বসত্তার শিকড়ে-শিকড়ে কেঁপে উঠল প্রাণের চাঞ্চল্য।
কে জানে কোথা হ'তে একটি অতি সূক্ষ্মস্বর
সবার কানে-কানে বললে,
চলো সার্থকতার তীর্থে।
এই বাণী জনতার কণ্ঠে-কণ্ঠে মিলিত হ'য়ে
একটি মহৎ প্রেরণায় বেগবান হ'য়ে উঠল।
পুরুষেরা উপরের দিকে চোখ তুললে,
জোড় হাত মাথায় ঠেকালে মেয়েরা।
শিশুরা করতালি দিয়ে হেসে উঠল।
প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথায় সোনার রঙের চন্দন পরালে,
সবাই ব'লে উঠল, "ভাই, আমরা তোমার বন্দনা করি॥"

যাত্রীরা চারিদিক থেকে বেরিয়ে পড়ল—
সমুদ্র পেরিয়ে, পর্বত ডিঙিয়ে, পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হ'য়ে—
এল নীল নদীর দেশ থেকে, গঙ্গার তীর থেকে,
তিব্বতের হিমমজ্জিত অধিত্যকা থেকে ;
প্রাকাররক্ষিত নগরের সিংহদ্বার দিয়ে,
লতাজালজটিল অরণ্যে পথ কেটে।

কেউ আসে পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ হাতিতে,
কেউ রথে চীনাংশুকের পতাকা উড়িয়ে।
নানা ধর্মের পূজারি চলল ধূপ জ্বালিয়ে, মন্ত্র প'ড়ে ;
রাজা চলল, অনুচরদের বর্শা-ফলক রৌদ্রে দীপ্যমান,
ভেরী বাজে গুরুগুরু মেঘমন্দ্রে।
ভিক্ষু আসে ছিন্ন কন্থা প'রে,
আর রাজ-অমাত্যের দল স্বর্ণলাঞ্ছন-খচিত উজ্জ্বল বেশে ;—
জ্ঞানগরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে
চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক।
মেয়েরা চলেচে কলহাস্যে, কত মাতা, কুমারী, কত বধূ ;
থালায় তাদের শ্বেতচন্দন, ঝারিতে গন্ধসলিল।
বেশ্যাও চলেচে সেই সঙ্গে, তীক্ষ্ণ তাদের কণ্ঠস্বর,
অতি-প্রকট তাদের প্রসাধন।
চলেছে পঙ্গু, খঞ্জ, অন্ধ আতুর,
আর সাধুবেশী ধর্মব্যবসায়ী,
দেবতাকে হাটে-হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।
সার্থকতা !
স্পষ্ট ক'রে কিছু বলে না,—কেবল নিজের লোভকে মহৎ নাম ও
বৃহৎ মূল্য দিয়ে ওই শব্দটার ব্যাখ্যা করে,
আর শাস্তিশঙ্কাহীন চৌর্যবৃত্তির অনন্ত সুযোগ ও আপন মলিন
ক্লিন্ন দেহমাংসের অক্লান্ত লোলুপতা দিয়ে কল্পস্বর্গ রচনা করে॥

দয়াহীন দুর্গম পথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ।
ভক্ত চলেচে, তার পশ্চাতে বলিষ্ঠ এবং শীর্ণ,
তরুণ এবং জরাজর্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা,
আর যারা অর্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে।
কেউ বা ক্লান্ত বিক্ষতচরণ, কারো মনে ক্রোধ, কারো মনে সন্দেহ
তারা প্রতি পদক্ষেপ গণনা করে আর শুধায়, কত পথ বাকি।

তার উত্তরে ভক্ত শুধু গান গায়।
শুনে তাদের ভ্রূ কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারে না,
চলমান জনপিণ্ডের বেগ এবং অনতিব্যক্ত আশার তাড়না
তাদের ঠেলে নিয়ে যায়।
ঘুম তাদের ক'মে এল, বিশ্রাম তারা সংক্ষিপ্ত করলে,
পরস্পরকে ছাড়িয়ে চলবার প্রতিযোগিতায় তারা ব্যগ্র,
ভয়, পাছে বিলম্ব ক'রে বঞ্চিত হয়।
দিনের পর দিন গেল।
দিগন্তের পর দিগন্ত আসে,
অজ্ঞাতের আমন্ত্রণ অদৃশ্য সংকেতে ইঙ্গিত করে।
ওদের মুখের ভাব ক্রমেই কঠিন
আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হ'তে থাকে॥

৬

রাত হয়েচে।
পথিকেরা বটতলায় আসন বিছিয়ে বসল।
একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিবে, অন্ধকার নিবিড়,
যেন নিদ্রা ঘনিয়ে উঠল মূর্চ্ছায়।
জনতার মধ্য থেকে কে একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বললে,
"মিথ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চনা করেচ।"
ভর্ৎসনা এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে উদগ্র হ'তে থাকল।
তীব্র হ'লো মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হ'লো পুরুষদের তর্জন।
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে
হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
রাত্রি নিস্তব্ধ।

ঝরনার কলশব্দ দূর থেকে ক্ষীণ হ'য়ে আসছে।
বাতাসে যূথীর মৃদু গন্ধ ॥

৭

যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত।
মেয়েরা কাঁদচে, পুরুষেরা উত্ত্যক্ত হ'য়ে ভৎর্সনা করচে, চুপ করো।
কুকুর ডেকে ওঠে, চাবুক খেয়ে আর্ত কাকুতিতে তার ডাক থেমে যায়।
রাত্রি পোহাতে চায় না।
অপরাধের অভিযোগ নিয়ে মেয়ে পুরুষে তর্ক তীব্র হ'তে থাকে।
সবাই চীৎকার করে, গর্জন করে,
শেষে যখন খাপ থেকে ছুরি বেরোতে চায়
এমন সময় অন্ধকার ক্ষীণ হ'লো,
প্রভাতের আলো গিরিশৃঙ্গ ছাপিয়ে আকাশ ভ'রে দিলে।
হঠাৎ সকলে স্তব্ধ;
সূর্যরশ্মির তর্জনী এসে স্পর্শ করল
রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্ত ললাট।
মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, পুরুষেরা মুখ ঢাকল দুই হাতে।
কেউ বা অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে চায়, পারে না;
অপরাধের শৃঙ্খলে আপন বলির কাছে তারা বাঁধা।
পরস্পরকে তারা শুধায়, "কে আমাদের পথ দেখাবে।"
পূর্ব দেশের বৃদ্ধ বললে,
"আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাবে।"
সবাই নিরুত্তর ও নতশির।
বৃদ্ধ আবার বললে, "সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব,
কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত
সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।"
সকলে দাঁড়িয়ে উঠল, কণ্ঠ মিলিয়ে গান ধরলে,
"জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়॥"

৮

তরুণের দল ডাক দিল, "চলো যাত্রা করি,
প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে,"
হাজার কণ্ঠের ধ্বনি-নির্ঝরে ঘোষিত হ'লো—
"আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর।"
উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক,
মৃত্যুবিপদকে তুচ্ছ করেচে
সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ।
তারা আর পথ শুধায় না, তাদের মনে নেই সংশয়,
চরণে নেই ক্লান্তি।
মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অন্তরে বাহিরে;
সে-যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েচে
এবং জীবনের সীমাকে করেচে অতিক্রম।
তারা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেচে যেখানে বীজ বোনা হ'লো,
সেই ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে, যেখানে শস্য হয়েচে সঞ্চিত,
সেই অনুর্বর ভূমির উপর দিয়ে
যেখানে কঙ্কালসার দেহ ব'সে আছে প্রাণের কাঙাল;
তারা চলেচে প্রজাবহুল নগরের পথ দিয়ে,
চলেচে জনশূন্যতার মধ্যে দিয়ে
যেখানে বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ,
চলেচে লক্ষ্মীছাড়াদের জীর্ণ বসতি বেয়ে
আশ্রয় যেখানে আশ্রিতকে বিদ্রূপ করে।

রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের দীর্ঘ প্রহর কাটল পথে-পথে।
সন্ধ্যাবেলায় আলোক যখন ম্লান তখন তারা কালজ্ঞকে শুধায়,
"ঐ কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণ-চূড়া?"
সে বলে, "না, ও যে সন্ধ্যাভ্রশিখরে
অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান আভা।"

তরুণ বলে, "থেমো না বন্ধু, অন্ধ তমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে
আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।"
অন্ধকারে তারা চলে।
পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে,
পায়ের তলার ধূলিও যেন নীরব স্পর্শে দিক চিনিয়ে দেয়।
স্বর্গপথযাত্রী নক্ষত্রের দল মূক সংগীতে বলে, "সাথি, অগ্রসর হও।"
অধিনেতার আকাশবাণী কানে আসে, "আর বিলম্ব নেই।"

৯

প্রত্যুষের প্রথম আভা
অরণ্যের শিশিরবর্ষী পল্লবে-পল্লবে ঝলমল ক'রে উঠল।
নক্ষত্রসংকেতবিদ জ্যোতিষী বললে, "বন্ধু, আমরা এসেচি।"
পথের দুইধারে দিক্‌প্রান্ত অবধি
পরিণত শস্যশীর্ষ স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে দোলায়মান,—
আকাশের স্বর্ণলিপির উত্তরে ধরণীর আনন্দবাণী।
গিরিপদবর্তী গ্রাম থেকে নদীতলবর্তী গ্রাম পর্যন্ত
প্রতিদিনের লোকযাত্রা শান্ত গতিতে প্রবহমান।
কুমোরের চাকা ঘুরচে গুঞ্জনস্বরে,
কাঠুরিয়া হাটে আনচে কাঠের ভার,
রাখাল ধেনু নিয়ে চলেচে মাঠে,
বধূরা নদী থেকে ঘট ভ'রে যায় ছায়াপথ দিয়ে।
কিন্তু কোথায় রাজার দুর্গ, সোনার খনি,
মারণ উচাটনমন্ত্রের পুরাতন পুঁথি?
জ্যোতিষী বললে, "নক্ষত্রের ইঙ্গিতে ভুল হ'তে পারে না,
তাদের সংকেত এইখানেই এসে থেমেচে।"
এই ব'লে ভক্তিনম্রশিরে
পথপ্রান্তে একটি উৎসের কাছে গিয়ে সে দাঁড়ালো।
এই উৎস থেকে জলস্রোত উঠচে যেন তরল আলোক,
প্রভাত যেন হাসি-অশ্রুর গলিত-মিলিত গীতধারায় সমুচ্ছল।

নিকটে তালি-কুঞ্জতলে একটি পর্ণকুটির
অনির্বচনীয় স্তব্ধতায় পরিবেষ্টিত।
দ্বারে অপরিচিত সিন্ধুতীরের কবি গান গেয়ে বলচে,
"মাতা, দ্বার খোলো।"

১০

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্ন প্রান্তে
তির্যক হ'য়ে পড়েচে।
সম্মিলিত জন-সংঘ আপন নাড়িতে-নাড়িতে যেন শুনতে পেলে
সৃষ্টির সেই প্রথম পরম বাণী, "মাতা, দ্বার খোলো।"
দ্বার খুলে গেল।

মা ব'সে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
ঊষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিল আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে,
"জয় হোক মানুষের, ঐ নবজাতকের, ঐ চিরজীবিতের।"
সকলে জানু পেতে বসল, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী,
জ্ঞানী এবং মূঢ়—
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে, "জয় হোক মানুষের,
ঐ নবজাতকের, ঐ চিরজীবিতের।"

১০. আমি

আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'লো সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হ'য়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্ব'লে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর—
সুন্দর হ'লো সে।

তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হ'য়ে।
মানুষের অহংকার পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে—
না, না, না,
না-পান্না, না-চুনি, না-আলো, না-গোলাপ,
না-আমি, না-তুমি।
ওদিকে, অসীম যিনি, তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে, "আমি"।
সেই আমি-র গহনে আলো আঁধারের ঘটল সংগম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস ;
"না" কখন ফুটে উঠে হ'লো "হাঁ", মায়ার মন্ত্রে
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।

একে বোলো না তত্ত্ব ;
আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব-আমি-র রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ।
পণ্ডিত বলছেন—
বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,
মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীর পাঁজরের কাছে

একদিন দেবে চরম টান তার সাগরে পর্বতে ;
মর্ত্যলোকে মহাকালের নূতন খাতায়
পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,
গিলে ফেলবে দিন রাতের জমাখরচ ;
মানুষের কীর্তি হারাবে অমরতার ভান,
তার ইতিহাসে লেপে দেবে
অনন্ত রাত্রির কালি।
মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রং,
মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস।
শক্তির কম্পন চলবে আকাশে-আকাশে,
জ্বলবে না কোথাও আলো।
বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল নাচবে,
বাজবে না স্বর।
সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন ব'সে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।
তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ-বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই,—
"তুমি সুন্দর,"
"আমি ভালোবাসি।"
বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগযুগান্তর ধ'রে ;
প্রলয়সন্ধ্যায় জপ করবেন—
"কথা কও, কথা কও,"
বলবেন—"বলো, তুমি সুন্দর,"
বলবেন—"বলো, আমি ভালোবাসি ?"

১১. 'মধ্যদিনে যবে গান'

মধ্যদিনে যবে গান
বন্ধ করে পাখি,
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী।
প্রান্তর-প্রান্তের কোণে
রুদ্র বসি তাই শোনে,
মধুরের স্বপ্নাবেশে
ধ্যানমগ্ন আঁখি—
হে রাখাল, বেণু যবে
বাজাও একাকী॥

সহসা উচ্ছ্বসি উঠে
ভরিয়া আকাশ
তৃষাতপ্ত বিরহের
নিরুদ্ধ নিশ্বাস।
অম্বরপ্রান্তের দূরে
ডম্বরু গম্ভীর সুরে
জাগায় বিদ্যুৎ-ছন্দে
আসন্ন বৈশাখী।
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী॥

১২. 'নীলাঞ্জনছায়া'

নীলাঞ্জনছায়া,
প্রফুল্ল কদম্ববন,
জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত,
বনবীথিকা ঘনসুগন্ধ।
মন্থর নব নীলনীরদ-
পরিকীর্ণ দিগন্ত।

চিত্ত মোর পন্থহারা
কান্তাবিরহকান্তারে ॥

১৩. 'সেদিন দুজনে'

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে,
ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।
এই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে-ক্ষণে
যেন জাগে মনে, ভুলো না ॥

সেদিন বাতাসে ছিলো, তুমি জানো,
আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো,
আকাশে-আকাশে আছিল ছড়ানো
তোমার হাসির তুলনা ॥

যেতে-যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে
চাঁদ উঠেছিল গগনে।
দেখা হয়েছিলো তোমাতে-আমাতে
কী জানি কী মহা লগনে।
এখন আমার বেলা নাহি আর,
বহিব একাকী বিরহের ভার,
বাঁধিনু যে-রাখি পরানে তোমার
সে-রাখি খুলো না, খুলো না ॥

১৪. 'ঘুমের ঘন গহন হ'তে'

ঘুমের ঘন গহন হ'তে যেমন আসে স্বপ্ন,
তেমনি উঠে এসো, এসো।
শমী-শাখার বক্ষ হ'তে যেমন জ্বলে অগ্নি
তেমনি তুমি এসো এসো।
ঈশানকোণে কালো মেঘের নিষেধ বিদারি
যেমন আসে সহসা বিদ্যুৎ

তেমনি তুমি চমক হানি এসো হৃদয়তলে,
এসো তুমি, এসো তুমি, এসো তুমি, এসো।
আঁধার যবে পাঠায় ডাক মৌন ইশারায়
যেমন আসে কালপুরুষ সন্ধ্যাকাশে
তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো, এসো।
সুদূর হিমগিরির শিখরে
মন্ত্র যবে প্রেরণ করে তাপস বৈশাখ
প্রখর তাপে কঠিন ঘন তুষার গলায়ে
বন্যাধারা যেমন নেমে আসে,
তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো, এসো॥

১৫. 'প্রথম দিনের সূর্য'

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চ'লে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগর-তীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

১৬. 'রূপনারানের কূলে'

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ-জগৎ
স্বপ্ন নয়।

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে-আঘাতে
বেদনায়-বেদনায় ;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ-জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

১৭. মধ্যরাত্রি

দ্যাখো সখি আঁধারের পানে
চেয়ে আছে দুটি শুভ্র তারা।
দুটি শিখা বিকম্পিত প্রাণে
চেয়ে আছে স্থিররাত্রি পানে,
আঁধারের রহস্যের টানে।
দুটি আলো হ'য়ে আত্মহারা।
রাখো সখি জেলে মোর প্রাণে
আলো ভরা দুটি কালো তারা।

১৮. ব্যর্থজীবন

মুখস্থে প্রথম কভু হইনি কেলাসে।
হৃদয় ভাঙেনি মোর কৈশোর-পরশে।
কবিতা লিখিনি কভু সাধু-আদিরসে।
যৌবন-জোয়ারে ভেসে, ডুবিনি বিলাসে।

চাটুপটু বক্তা নহি, বড়ো এজলাশে।
উদ্ধার করিনি দেশ, টানিয়া চরসে।
পুত্রকন্যা হয় নাই বরষে-বরষে।
অশ্রুপাত করি নাই মদের গেলাশে।

পয়সা করিনি আমি, পাইনি খেতাব।
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব।

অন্যে কভু দিই নাই নীতি-উপদেশ।
চরিত্রে দৃষ্টান্ত নহি, দেশে কি বিদেশে।
বুদ্ধি কভু নাহি পাকে, পাকে যদি কেশ।
তপস্বী হব না আমি জীবনের শেষে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)

১৯. কুঁকড়ো

সোনালিয়া,
প্রায় সবই তো শুনলে, আরো যদি জানতে চাও তো বলি,
আমাকে স্থর খুঁজে-খুঁজে তো গান গাইতে হয় না,
স্থর আপনি ওঠে আমার মধ্যে মাটি থেকে লতায় পাতায়
রস যেমন ক'রে উঠে আসে,
গানও তেমনি ক'রে আমার মধ্যে ছুটে আসে আপনি,
জন্মভূমির বুকের রস।
পুব আকাশের তীরে সকালটি ফুটি-ফুটি করছে,
ঠিক সেই সময় আমার মধ্যে উথলে উঠতে থাকে স্থর
আর গান,
বুক আমার কাঁপতে থাকে তারি ধাক্কায়,
আর আমি বুঝি,
আমি না-হ'লে সরস মাটির এই স্থন্দর পৃথিবীর
বুকের কথা খুলে বলাই হবে না।

সকালের সেই শুভ লগ্নটিতে মাটি আর আমি যেন এক হ'য়ে যাই,
মাটির দিকে আমি আপনাকে নিয়ে যাই,
আর পৃথিবী আমাকে সুন্দর শাঁখের মতো
নিজের নিশ্বেসে পরিপূর্ণ ক'রে বাজাতে থাকে,
আমার মনে হয় তখন আমি যেন আর পাখি নই,
আমি যেন একটি আশ্চর্য বাঁশি,
যার মধ্য দিয়ে
পৃথিবীর কান্না আকাশের বুকে গিয়ে বাজছে।

অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভোর রাতের হিম মাটি এই-যে কাঁদন জানাচ্ছে,
আকাশের কাছে তার অর্থ কী, সোনালিয়া,
সে আলো ভিক্ষে করছে,
একটুখানি সোনার আলো-মাখা দিন তারি প্রার্থনা,
ভোর বেলার সবাই কাঁদছে, দেখবে,
আলো চেয়ে,
গোলাপের কুঁড়ি সে অন্ধকারে কাঁদছে আর বলছে,
আলো দিয়ে ফোটাও।
ওই-যে খেতের মাঝ একটা কাস্তে, চাষারা ভুলে এসেছে,
সে ভিজে মাটিতে প'ড়ে মরচে ধ'রে মরবার ভয়ে চাচ্ছে আলো,
একটু আলো এসে যেন রামধনুকের রঙে
চারদিকের ধানের শিষ রাঙিয়ে দেয়।

নদী কেঁদে বলছে, আলো আসুক,
আমার বুকের তলা পর্যন্ত গিয়ে আলো পড়ুক।
সব জিনিস চাচ্ছে যেন আপন আলোয় তাদের রং ফিরে পায়,
আপনার-আপনার হারানো ছায়া ফিরে পায়,
তারা সারা রাত বলছে, আলো কেন পাচ্ছিনে,
আলো কী দোষে হারালেম।

আর আমি কুঁকড়ো তাদের সে-কান্না শুনে কেঁদে মরি,
আমি শুনতে পাই ধানখেত সব কাঁদছে,
শরতের আলোয় সোনার ফসলে ভ'রে ওঠবার জন্যে,
রাঙা মাটির পথ সব কাঁদছে,
যারা চলাচল করবে তাদের ছায়ার পরশ
বুকের উপর বুলিয়ে নিতে আলোয়।
শীতে গাছের উপরের ফল আর গাছের তলায়
গোল-গোল নুড়িগুলি পর্যন্ত
আলো, তাপ চেয়ে কাঁদছে, শুনি।
বনে-বনে সূর্যের আলোয় কে না চাচ্ছে বেঁচে উঠতে,
জেগে উঠতে,
কে না আলোর জন্যে কাঁদছে সারা রাত।
এই জগৎ সুদ্ধ সবার কান্না, আলোর প্রার্থনা,
এক হ'য়ে যখন আমার কাছে আসে,
তখন আমি আর ছোটো পাখিটি থাকিনে,
বুক আমার বেড়ে যায়,
সেখানে প্রকাণ্ড আলোর বাজনা বাজছে, শুনি,
আমার দুই পাঁজর কাঁপিয়ে তারপর আমার গান ফোটে,
"আ-লো-র ফুল!"
আর তাই শুনে পুবের আকাশ গোলাপি কুঁড়িতে ভ'রে উঠতে থাকে,
কাকসন্ধ্যার কা-কা শব্দ দিয়ে রাত্রি আমার গানের সুর
চেপে দিতে চায়,
কিন্তু আমি গান গেয়ে চলি,
আকাশে কাগডিমে রং লাগে তবু আমি গেয়ে চলি আলোর ফুল,
তারপর হঠাৎ চমকে দেখি
আমার বুক সুরের রঙে রাঙা হ'য়ে গেছে,
আর আকাশে আলোর জবাফুলটি ফুটিয়ে তুলেছি
আমি,
পাহাড়তলির কুঁকড়ো।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮)

২০. যৌবন-চাঞ্চল্য

ভুটিয়া যুবতী চলে পথ ;
আকাশ কালিমামাখা কুয়াশায় দিক ঢাকা।
চারিধারে কেবলই পর্বত ;
যুবতী একেলা চলে পথ।
এদিক-ওদিক চায় গুনগুনি গান গায়,
কভু বা চমকি চায় ফিরে ;
গতিতে ঝরে আনন্দ উথলে নৃত্যের ছন্দ
আঁকাবাঁকা গিরিপথ ঘিরে।
ভুটিয়া যুবতী চলে পথ !

টসটসে রসে ভরপুর—
আপেলের মতো মুখ আপেলের মতো বুক
পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর ;
যৌবনের রসে ভরপুর।
মেঘ ডাকে কড়-কড় বুঝি বা আসিবে ঝড়,
একটু নাহিক ডর তাতে ;
উঘারি বুকের বাস, পূরায় বিচিত্র আশ
উরস পরশি নিজ হাতে !

অজানা ব্যথায় সুমধুর—
সেথা বুঝি করে গুরুগুর !
যুবতী একেলা পথ চলে ;
পাশের পলাশ-বনে কেন চায় অকারণে ?
আবেশে চরণ দুটি টলে—
পায়ে-পায়ে বাধিয়া উপলে !

আপনার মনে যায় আপনার মনে গায়,
তবু কেন আনপানে টান ?
করিতে রসের সৃষ্টি চাই কি দশের দৃষ্টি ?
—স্বরূপ জানেন ভগবান !

সহজে নাচিয়া যেবা চলে
একাকিনী ঘন বনতলে—
জানি নাকো তারো কী ব্যথায়
আঁখিজলে কাজল ভিজায়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)

২১. দূরের পাল্লা

(অংশ)

ছিপখান তিন-দাঁড়-
তিনজন মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর
দ্যায় দূর পাল্লা।

কঞ্চির তীর-ঘর
ঐ চর জাগছে,
বন-হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাকছে।

চুপ চুপ—ওই ডুব
দ্যায় পানকৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোমটার বউটি।

রূপশালি ধান বুঝি
এই দেশে সৃষ্টি,
ধুপছায়া যার শাড়ি
তার হাসি মিষ্টি।

মুখখানি মিষ্টি রে
চোখ দুটি ভোমরা
ভাব-কদমের—ভরা
রূপ ছাখো তোমরা।

পান বিনে ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোমরা,
রূপশালি-ধান-ভানা
রূপ ছাখো তোমরা।

পান সুপারি! পান সুপারি!
এই খানেতে শঙ্কা ভারি,
পাঁচ পীরেরই শিন্নি মেনে
চল রে টেনে বৈঠা হেনে;
বাঁক সমুখে, সামনে ঝুঁকে,
বাঁয় বাঁচিয়ে, ডাইনে রুখে
বুক দে টানো, বৈঠা হানো—
সাত সতেরো কোপ কোপানো।
হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনি যেন ঝামর-চুলো
নাচতেছিলো সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থমকে গেলো।
জমজমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এলো, রাত্রি এলো

ঝাপসা আলোয় চরের ভিতে
ফিরছে কারা মাছের পাছে,
পীর বদরের কুদ্‌রতিতে
নৌকো বাঁধা হিজল গাছে।

*　　*　　*

লক-লক শর-বন
বক তায় মগ্ন,
চুপচাপ চারদিক
সন্ধ্যার লগ্ন।

চারদিক নিঃসাড়,
ঘোর-ঘোর রাত্রি,
ছিপখান তিন-দাঁড়,
চারজন যাত্রী।

*　　*　　*

জড়ায় ঝাঁঝি দাঁড়ের মুখে,
ঝাউয়ের বীথি হাওয়ায় ঝুঁকে
ঝিমায় বুঝি ঝিঁঝির গানে—
স্বপন পানে পরান টানে।
তারায় ভরা আকাশ ও কি
ভুলোয় পেয়ে ধুলোর 'পরে
লুটিয়ে প'লো আচম্বিতে
কুহক-মোহ মন্ত্র-ভরে।

কেবল তারা! কেবল তারা!
শেষের শিরে মানিক পারা,
হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি
কেবল তারা যেথায় চাহি।

কোথায় এলো নৌকোখানা,
তারার ঝড়ে হই রে কানা,
পথ ভুলে কি এই তিমিরে
নৌকো চলে আকাশ চিরে !

*　　　　*　　　　*

আর জোর দেড় ক্রোশ—
জোর দেড় ঘণ্টা,
টান ভাই টান সব—
নেই উৎকণ্ঠা।

চাপ্-চাপ্ শ্যাওলার
দ্বীপ সব সার-সার,—
বৈঠার ঘায় সেই
দ্বীপ সব নড়ছে,
ভিলভিলে হাঁস তায়
জল-গায় চড়ছে।

ওই মেঘ জমছে,
চল ভাই সমঝে,
গাও গান, দাও শিস—
বকশিশ ! বকশিশ !

খুব জোর ডুব-জল,
বয় স্রোত ঝিরঝির,
নেই ঢেউ কল্লোল,
নয় দূর নয় তীর।

নেই, নেই শঙ্কা,
চল সব ফুর্তি,—
বকশিশ টঙ্কা,
বকশিশ ফুর্তি।

ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায়,
ঝাউগাছ দুলছে,
ঢোল-কলমির ফুল
তন্দ্রায় ঢুলছে।

২২. চম্পা

আমারে ফুটিতে হ'লো বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে,
বিষণ্ন যখন বিশ্ব নির্মম গ্রীষ্মের পদানত;
রুদ্র তপস্যার বনে আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হ'লো—সাহসিকা অপ্সরার মতো।

বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট মর্মরি' উঠিলো একবার,
বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোনা গেলো ক্লান্ত কুহুস্বর;
জন্ম-যবনিকা-প্রান্তে মেলি' নব নেত্র সুকুমার
দেখিলাম জলস্থল,—শূন্য, শুষ্ক, বিহ্বল, জর্জর।

তবু এনু বাহিরিয়া,—বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান,—
চম্পা আমি,—খর তাপে আমি কভু ঝরিবো না মরি'
উগ্র মদ্য-সম রৌদ্র—যার তেজে বিশ্ব মূহ্যমান,—
বিধাতার আশীর্বাদে আমি তা সহজে পান করি।

ধীরে এনু বাহিরিয়া, উষার আতপ্ত কর ধরি';
মূর্ছে দেহ, মোহে মন,—মুহুর্মুহু করি অনুভব!
সূর্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি';
দিনদেবে নমস্কার! আমি চম্পা! সূর্যের সৌরভ।

২৩. যক্ষের নিবেদন

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মুরতি ধরি' আজ মন্দ্র-মন্থর বচন কও;
সূর্যের রক্তিম নয়নে তুমি, মেঘ! দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি' চ'লে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধুম।

বৃক্ষের গর্ভেই রয়েছে আজো যেই—আজ নিবাস যার গোপনলোক,
সেই সব পল্লব সহসা ফুটিবার হৃষ্ট চেষ্টায় কুসুম হোক ;
গ্রীষ্মের হোক শেষ, ভরিয়া সানুদেশ স্নিগ্ধ গম্ভীর উঠুক তান,
যক্ষের দুঃখের করো হে অবসান, যক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ !

শৈলের পইঠায় দাঁড়ায়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ,
মূর্ছার মন্তর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কার আকুল শ্বাস।
ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর মৌন কোন সুর বাজায় মন,
বক্ষের পঞ্জর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষে দুঃখের নীলাঞ্জন।

রাত্রির উৎসব জাগালে দিবসেই, তাই তো তন্দ্রায় ভুবন ছায়,
রাত্রির গুণ সব দিনেরে দিলে দান, তাই তো বিচ্ছেদ দ্বিগুণ, হায় ;
ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু সে তুমি, দেব ! পূজ্য ! লও মোর পূজার ফুল,
পুষ্কর বংশের চূড়া যে তুমি মেঘ ! বন্ধু ! দৈবের ঘুচাও ভুল !

নিষ্ঠুর যক্ষেশ, নাহিক কৃপা-লেশ, রাজ্যে আর তাঁর বিচার নেই,
আজ্ঞার লঙ্ঘন করিলো একে, আর শাস্তি ভুঞ্জান দুজনকেই !
হায় মোর কান্তার না ছিলো অপরাধ, মিথ্যা সয় সেই কতই ক্লেশ,
দুর্ভর বিচ্ছেদ অবলা বুকে বয়, পাংশু কুন্তল, মলিন বেশ।

বন্ধুর মুখ চাও, সখা হে সেথা যাও, দুঃখ দুস্তর তরাও ভাই,
কল্যাণ-সংবাদ কহিয়ো কানে তার, হায়, বিলম্বের সময় নাই ;
বৃন্তের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন, হায় গো, বল তার কতই আর ?
বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মের তাপেতে সে শুকায়, যাও হে দাও তায় সলিল-ধার।

নির্মল হোক পথ,—শুভ ও নিরাপদ, দূর-সুদুর্গম নিকট হোক,
হ্রদ, নদ, নির্ঝর, নগরী মনোহর, সৌধ সুন্দর জুড়াক চোখ ;
চঞ্চল-খঞ্জন-নয়না নারীগণ বর্ষা-মঙ্গল করুক গান,
বর্ষার সৌরভ, বলাকা-কলরব, নিত্য উৎসব ভরুক প্রাণ !

পুষ্পের তৃষ্ণার করো হে অবসান, হোক বিনিঃশেষ যূথীর ক্লেশ,
বর্ষায়, হায়, মেঘ! প্রবাসে নাই সুখ,—হায় গো নাই, নাই সুখের লেশ
যাও ভাই একবার মুছাতে আঁখি তার, প্রাণ বাঁচাও, মেঘ! সদয় হও,
"বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক", বন্ধু! বন্ধুর আশিস লও।

সুকুমার রায়চৌধুরী (১৮৮৭-১৯২৩)

২৪. শব্দকল্পদ্রুম

ঠাশ ঠাশ দ্রুম দ্রাম, শুনে লাগে খটকা,—
ফুল ফোটে? তাই বলো! আমি ভাবি পটকা!
শাঁইশাঁই বনবন, ভয়ে কান বন্ধ—
ওই বুঝি ছুটে যায় সে-ফুলের গন্ধ?
হুড়মুড় ধুপধাপ—ও কি শুনি ভাই রে!
দেখছো না হিম পড়ে—যেও নাকো বাইরে।
চুপ চুপ ঐ শোন, ঝুপঝাপ ঝপা—স।
চাঁদ বুঝি ডুবে গেলো?—গবগব গবা—স।
খ্যাঁশ-খ্যাঁশ ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ, রাত কাটে ঐ রে।
দুড়দাড় চুরমার—ঘুম ভাঙে কই রে।
ঘর্ঘর ভনভন ঘোরে কত চিন্তা।
কত মন নাচে শোন—ধেই ধেই ধিনতা
ঠুংঠাং ঢংঢং, কত ব্যথা বাজে রে
ফটফট বুক ফাটে তাই মাঝে-মাঝে রে!
হৈ হৈ মার মার, 'বাপ বাপ' চীৎকার—
মালকোঁচা মারে বুঝি? স'রে পড় এইবার!

২৫. রামগরুড়ের ছানা

রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা।
হাসির কথা শুনলে বলে,
"হাসবো না না, না না!"

সদাই মরে ত্রাসে— ঐ বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিটমিটিয়ে
তাকায় আশে-পাশে।
ঘুম নাহি তার চোখে আপনি ব'কে-ব'কে
আপনারে কয় "হাসিস যদি
মারবো কিন্তু তোকে।"
যায় না বনের কাছে, কিংবা গাছে-গাছে,
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে!
সোয়াস্তি নেই মনে— মেঘের কোণে-কোণে
হাসির বাষ্প উঠছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে!
ঝোপের ধারে-ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে-ঠারে।
হাসতে-হাসতে যারা হচ্ছে কেবল সারা
রামগরুড়ের লাগছে ব্যথা
বুঝছে না কি তারা?
রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাশা
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়
নিষেধ সেথায় হাসা।

২৬. হুলোর গান

বিদঘুটে রাত্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা,
গাছপালা মিশমিশে মখমলে ঢাকা,
জট বাঁধা ঝুল-কালো বটগাছ তলে,
ধকধক জোনাকির চকমকি জ্বলে,
চুপচাপ চারদিকে ঝোপঝাড়গুলো—
আয় ভাই গান গাই আয় ভাই হুলো।

গীত গাই কানে-কানে চীৎকার ক'রে,
কোন গানে মন ভেজে শোন বলি তোরে—
পুবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।
চট ক'রে মনে পড়ে মটকার কাছে
মালপোয়া আধখানা কাল থেকে আছে।
দুড়দুড় ছুটে যাই দূর থেকে দেখি
প্রাণপণে ঠোঁট চাটে কানকাটা নেকী!
গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা
ধুক ক'রে নিভে গেলো বুক-ভরা আশা।
মন বলে আর কেন সংসারে থাকি
বিলকুল সব দেখি ভেল্কির ফাঁকি।
সব যেন বিচ্ছিরি সব যেন খালি,
গিন্নির মুখ যেন চিমনির কালি।
মন ভাঙা দুখ মোর কণ্ঠেতে পুরে
গান গাই আয় ভাই প্রাণফাটা সুরে।

২৭. 'শুনেছো কি ব'লে গেলো'

শুনেছো কি ব'লে গেলো সীতানাথ বন্দ্যো?
আকাশের গায়ে নাকি টক-টক গন্ধ?
টক-টক থাকে নাকো হ'লে পরে বৃষ্টি—
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি।

২৮. আবোলতাবোল

মেঘ-মুলুকে ঝাপসা রাতে,
রামধনুকের আবছায়াতে,
তাল-বেতালে খেয়াল সুরে
তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।

হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা
নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।
হেথায় রঙিন আকাশ তলে
স্বপন-দোলা হাওয়ায় দোলে,
সুরের নেশায় ঝরনা ছোটে,
আকাশকুসুম আপনি ফোটে,
রঙিয়ে আকাশ রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ।
আজকে দাদা যাবার আগে
বলবো যা মোর চিত্তে লাগে—
নাই বা তাহার অর্থ হোক
নাই বা বুঝুক বেবাক লোক।
আপনাকে আজ আপন হ'তে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।
ছুটলে কথা থামায় কে ?
আজকে ঠেকায় আমায় কে ?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ তবলা বাজে—
রাম-খটাখট ঘ্যাচাং ঘ্যাচ
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ।
আলোয় ঢাকা অন্ধকার
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।
গোপন প্রাণে স্বপন-দূত,
মঞ্চে নাচেন পঞ্চ ভূত।
হ্যাংলা হাতি চ্যাং-দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরানী পক্ষিরাজ—
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।

আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৮-১৯৫৪)

২৯. সুখবাদী

তারই 'পরে তব কোপ গো বন্ধু, তারই 'পরে তব কোপ,
যে-জন কিছুতে গিলিতে চায় না এই প্রকৃতির টোপ।
সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল,
গাছে-গাছে ফুল, ফুলে-ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল!
ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাবকবি,
সমসুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি।
তেলে সিন্দুরে এ সৌন্দর্যে 'ভবি' ভুলিবার নয়;
সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু উঠে দুঃখেরি জয়।
অতল দুঃখ-সিন্ধু,
হাল্কা সুখের তরঙ্গ তাহে নাচিয়া ভাঙিছে ইন্দু।
তাই দেখে যারা হয় মাতোয়ারা তীরে ব'সে গাহে গান
হায় গো বন্ধু তোমার সভায় তাহাদেরি বহু মান।
দিগন্তপারে তরঙ্গ-আড়ে যারা হাবুডুবু খায়,
তাদের বেদনা ঢাকে কি বন্ধু, তরঙ্গ-সুষমায়?
বজ্রে যে-জনা মরে,
নবঘন-শ্যাম-শোভার তারিফ সে-বংশে কেবা করে?
ঝড়ে যার কুঁড়ে উড়ে—
মলয়-ভক্ত হয় যদি, বলো কী বলিব সেই মূঢ়ে।
ফাল্গুনে হেরি' নব কিশলয় যারা আনন্দে ভাসে,
শীতে-শীতে ঝরা জীর্ণ পাতার কাহিনী না মনে আসে,
ফল দেখে যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুলদল লাগি,
তারা সভাকবি, আমরা বন্ধু, সুখবাদী বৈরাগী!

এই বিশ্বের ব্যবসার লাভ বন্ধু তুমি তো জানো,
একা ব'সে যবে রাতের খাতায় দুঃখের জের টানো।
জমাখরচের কৈফ্যৎ কেটে বাকি যে ফাজিল কত,
বাহির বিজ্ঞাপনে যাই বলো,—অন্তরে বুঝেছি তো!
বজায় থাকিতে খ্যাতি,—
সহসা জ্বালাবে কোন সন্ধ্যায় প্রলয়ের লাল বাতি!
সুখে মোড়া দুখে ভরা কত বড়ো রচিয়াছ কৌশল,
এ-ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফল।
সৌন্দর্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা,
সত্যের শাঁস কালো ব'লে খাসা রাঙা খোসা চোষে তারা।

বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কিবা?
মায়াবিনী নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রিদিবা।
চটক বা চখা কী জানে প্রেমের? বকে কি শিখাবে ধর্ম?
সহজস্বাধীন হিংস্র শ্বাপদ বুঝাবে জীবন-মর্ম!
অরণ্য-তরু জপিছে অন্ধ ঠেলাঠেলি অবিরাম,
কুসুম অলির অবাধ প্রণয়, উভয়ত কি আরাম!
বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা—
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধ'রে রঙিন বারাঙ্গনা!
খাদ্যে-খাদকে বাদ্যে-বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য,
ষড়-ঋতু ছলে ষড়-রিপু খেলে কাম হ'তে মাৎসর্য।
ছলে-বলে-কলে দুর্বলে হেথা প্রবল অত্যাচার;
এ যদি বন্ধু হয় তব ছায়া, কায়া তো চমৎকার!

শুনহ মানুষ ভাই!
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।
যদিও তোমারে ঘেরিয়া রয়েছে মৃত্যুর মহারাত্রি,
সৃষ্টির মাঝে তুমিই সৃষ্টিছাড়া দুখ-পথ-যাত্রী।
তোমাদেরি মাঝে আসে মাঝে-মাঝে রাজার দুলাল ছেলে,
পরের দুঃখে কেঁদে-কেঁদে যায় শত সুখ পায়ে ঠেলে।

কবি-আরাধ্য প্রকৃতির মাঝে কোথা আছে এর জুড়ি ?
অবিচারে মেঘ ঢালে জল, তাও সমুদ্র হ'তে চুরি !
সৃষ্টির সুখে মহা খুসি যারা, তারা নর নহে, জড় ;
যারা চিরদিন কেঁদে কাটাইল তারাই শ্রেষ্ঠতর।
মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ ;
সত্য সত্য সহস্র গুণ সত্য জীবের দুখ !

সত্য দুখের আগুনে, বন্ধু, পরান যখন জলে,
তোমার হাতের সুখ-দুখ-দান ফিরায়ে দিলেও চলে।

৩০. দেশোদ্ধার

বার-বার তিনবার,—
এবার বুঝেছি চাষা ছাড়া কভু হবে না দেশোদ্ধার !
শোন রে শ্রমিক শোন ভাই চাষা,
আমাদের বুকে যত ভালবাসা
ঢালিব বিলাব তোদের দুয়ারে অকাতরে অনিবার।

তোদের দুঃখে হায়—
পাষাণ হ'লেও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়।
ক'রো নাকো ভাই হীন আশঙ্কা,
এবার নয়নে ঘষিনি লঙ্কা ;
সত্য-সত্য ত্রিসত্য করি হৃদয় তোদেরই চায়।

ওরে চির পরাধীন !
তোরা না জানিস, মোরা জানি তোর কী কষ্টে কাটে দিন।
নানা পুঁথি প'ড়ে পেয়েছি প্রমাণ
তোরাই দেশের তেরো আনা প্রাণ ;
বৎসরে হায় বিশ টাকা আয়, তবু তোরা ভাষাহীন !

তোরাই যে ভাই দেশ ;—
তোদের দৈন্য-জন্য মায়ের কঙ্কাল অবশেষ।
মহার্ঘ হ'লে বেগুন পালং
যদিও ভিতরে চ'টে হই টং,
তবু তোর সেবা দেশেরই যে সেবা মনে-মনে বুঝি বেশ।

ওরে নাবালক চাষা!
আমরা তোদের ভাঙাবো নিদ্রা, মূক মুখে দিব ভাষা।
শ্রমিক চাষার দুঃখে ফর্দ
রচিতে ছুটিব লিলুয়া খড়্‌দ।
গড়িয়া আইন ভাঙি' বে-আইন জাগাইব নব আশা!

ওরে ওঠ-ওঠ জেগে ;—
তরুণ অরুণ-আলোকে জানা ও অজানা ব্যথায় লেগে!
সবলে স্কন্ধে তুলে নিয়ে হল,
পাঁচনে খেদায় বলদের দল ;
প্রভাতের মাঠে কলকোলাহলে দল বেঁধে চল বেগে।

জুড়ে দে লাঙল ক'ষে ;
ফালের আগায় যত উঁচু নিচু সমভূম কর চ'ষে।
মাথা উঁচু ক'রে আছে ঢ্যালাগুলো,
মইয়ের চাপনে ক'রে দে রে ধুলো ;
কাঁটার বংশ কর রে ধ্বংস জোরে-জোরে বিদে ঘ'ষে।

ফসল হবেই হবে!
আকাশ হইতে না নামে বৃষ্টি, পাতাল ফুঁড়িবি তবে।
আপনার হাতে বুনেছিস যাকে,
টেনে তুলে বলে রু'য়ে দিবি পাঁকে ;
বাজিবে মাদল ঝরিবে বাদল বর্ষার উৎসবে।

সেই দুর্যোগ-উৎসব যবে ঘনাইবে চারিধার,
মেঘে ঝড়ে জলে বজ্রে বাদলে রচিয়া অন্ধকার ;—
স'রে পড়ি যদি ক্ষমা কোরো, দাদা,
খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা ?
মনে কোরো ভাই মোরা চাষা নই ;—চাষার ব্যারিস্টার !

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)

৩১. পান্থ

[দার্শনিক সন্ন্যাসী Schopenhauer-এর উদ্দেশ্যে]

(অংশ)

১২

যে-স্বপ্ন হরণ তুমি করিবারে চাও, স্বপ্নহর !
তারি মায়া-মুগ্ধ আমি, দেহে মোর আকণ্ঠ পিপাসা।
মৃত্যুর মোহন-মন্ত্রে জীবনের প্রতিটি প্রহর
জপিছে আমার কানে সকরুণ মিনতির ভাষা !
নিষ্ফল কামনা মোরে করিয়াছে কল্প-নিশাচর !
চক্ষু বুজি অদৃষ্টের সাথে আমি খেলিতেছি পাশা—
হেরে যাই বার-বার, প্রাণে মোর জাগে তবু দুরন্ত দুরাশা !

১৩

সুন্দরী সে-প্রকৃতিরে জানি আমি—মিথ্যা সনাতনী !
সত্যেরে চাহি না তবু, সুন্দরের করি আরাধনা—
কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার—হৃদয়ের বিশল্যকরণী !
স্বপনের মণিহারে হেরি তার সীমন্ত-রচনা !
নিপুণা নটিনী নাচে, অঙ্গে-অঙ্গে অপূর্ব লাবনি !
স্বর্ণপাত্রে সুধারস, না সে বিষ ?—কে করে শোচনা !
পান করি সুনির্ভয়ে, মুচকিয়া হাসে যবে ললিতলোচনা !

১৪

জানিতে চাহি না আমি কামনার শেষ কোথা আছে,
ব্যথায় বিবশ, তবু হোম করি জ্বালি কামানল !—
এ-দেহ ইন্ধন তায়—সেই সুখ !—নেত্রে মোর নাচে
উলঙ্গিনী ছিন্নমস্তা !—পাত্রে ঢালি লোহিত গরল !
মৃত্যু ভৃত্যরূপে আসি ভয়ে-ভয়ে পরসাদ যাচে !
মুহূর্তের মধু লুটি—ছিন্ন করি হৃদ্‌পদ্মদল !
যামিনীর ডাকিনীরা তাই হেরি এক সাথে হাসে খলখল !

১৫

চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম-দেবতারে,—
নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি,
অনন্ত রহস্যময়ী স্বপ্ন-সখী চির-অচেনারে
মনে হয় চিনি যেন—এই বিশ্বের সেই ঠাকুরানী !
নেত্র তার মৃত্যু-নীল !—অধরের হাসির বিথারে
বিস্মরণী রশ্মিরাগ ! কটিতলে জন্ম-রাজধানী।
উরসের অগ্নিগিরি সৃষ্টির উত্তাপ-উৎস !—জানি, তাহা জানি।

১৬

এ ভব-ভবনে আমি অতিথি যে তাহারি উৎসবে !—
জন্ম-মৃত্যু—দুই দ্বারে দাঁড়াইয়া সে করে বন্দনা !
অশ্রুজলে স্নানোদক ঢালি দেয় স্নেহের সৌরভে,
মুক্ত করি' কেশপাশ, পাদপীঠ করে সে মার্জনা !
নিঙাড়িয়া মর্ম-মধু ওষ্ঠে ধরে অতুল গৌরবে !
পরশে চন্দন-রস। মালাখানি দু'ভুজে রচনা !
আমারে তুষিবে বলি' প্রিয়া মোর ধূলি 'পরে দেয় আলিপনা !

১৭

তবু সে মোহিনী ! আহা, তাই বটে !—হে জ্ঞানী বৈরাগী,
এ-জ্ঞান কোথায় পেলে ?—মর্মে-মর্মে তুমি মহাকবি !

রুদ্ধপ্রাণে কুপিতা সে প্রকৃতির অভিশাপভাগী—
কল্পনার নিশিযোগে আঁধারিলে মনের অটবী!
অভ্রভেদী চিত্ত-চূড়া মৃত্তিকার পরশ তেয়াগি'
উঠিয়াছে মেঘলোকে!—সেথা নাই নিশান্তের রবি!—
বিদ্যুৎ-গর্জন-গানে নিত্য সেথা নৃত্য করে ভাবনা-ভৈরবী!

১৮

কহ মোরে, জাতিস্মর! কবে তুমি করেছিলে পান
ধরণীর মৃৎপাত্রে রমণীর হৃদয়ের রস?
পূর্বজন্ম-বিভীষিকা?—তারি ভার প্রেতের সমান
বক্ষে চাপি' স্মৃতিবিষে করিল কি বাসনা বিবশ?
ব্যথার চাতুরী শুধু?—মাধুরীতে ভরে নাই প্রাণ?
মধুরাতে মাধবীটি তুলে নিতে হ'ল না সাহস!
ওষ্ঠে হাসি, নেত্রে জল—বুঝিলে না অপরূপ জ্বালার হরষ!

১৯

জীবনের দুঃখ-সুখ বার-বার ভুঞ্জিতে বাসনা—
অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো!
যাতনার হাহারবে গাই গান,—তৃষার্ত রসনা
বলে, 'বন্ধু! উগ্র ওই সোমরস ঢালো, আরো ঢালো!'
তাই আমি রমণীর জায়া-রূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আর বার না নিবিতে গোধূলির আলো,
আমারি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের দীপখানি জ্বালো!

২০

আর যদি নাই ফিরি—এ-দুয়ারে না দিই চরণ?
অশ্রু আর হাসি মোর রেখে যাবো তোমার ভবনে,
এই শোক এই সুখ নব দেহে করিয়া বরণ,
মন সে অমর হবে বেদনার নূতন বসনে!

কাজলের রেখা আঁকা আঁখিপাতে,
'কাজল-লতা'টি ধ'রে আছে হাতে,
করমূলে বাঁধা লাল সুতা সেই—অলংকার !
শুনেছি সে রূপ চমৎকার !

পরেছে বসন—বুঝি লাল চেলি, ডালিম-ফুলী ?
দুরুদুরু হিয়া—মণিহার তায় উঠিছে দুলি'।
এয়োরা যখন শঙ্খ বাজায়
বধূ চমকিয়া ইতি-উতি চায়,
আকুল কবরী, রুখু-ভুখু চুল পড়িছে খুলি'
হিয়া দুরুদুরু উঠিছে দুলি'।

কতো দিবানিশি কাটানু স্বপনে—সেই সে মুখ
দেখিনি কখনো, তবু সে আমার ভরেছে বুক !
প্রাণের বিজনে ঝরিয়াছে ফুল—
সকালে শেফালি, বিকালে বকুল,
ফুটিয়াছে নীপ—বরষা-আসারে ভরসা-সুখ,
সে-মুখ আমার ভরেছে বুক।

এতদিনে বুঝি বিরহ-যামিনী হয়েছে ভোর—
বাঁশি বাজে ওই—এবার নয়নে লেগেছে ঘোর !
হাতে হাতে সেই বাঁধি' মালাখানি
আর কতখনে পরশিব পাণি ?
এসেছে কি আজি সে-সুখ-লগন জীবনে মোর—
স্বপন-রজনী হয়েছে ভোর ?

পাতি' ফুল-শেজ বসিব দুজনে কথা না বলি',
চিবুক ধরিয়া তুলিব আনন-কুসুম-কলি।

সে-রূপ নেহারি' আঁখি অনিমেষ—
প্রদীপ জ্বালায়ে হবে রাতি শেষ!
ভুলে যাব গান, ফুলের মধুও ভুলিবে অলি—
শুধু চেয়ে র'বো কথা না বলি'।

বধূরে আমার দেখিনি এখনো, শুনেছি তার
অপরূপ রূপ—চোখের চাহনি চমৎকার!
আর কত দেরি গোধূলি-লগন?
নিবিয়া আসিবে সারাটি গগন,
শুধু সেই চেলি উজলি তুলিবে অন্ধকার—
সেই আঁখি-তারা চমৎকার!

৩৩. বাঁধন

পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল
কলভাষে,
প্রিয়া বাঁধিয়াছে বাহুপাশে।
দীপ মিটিমিটি, শেষ হয় রাত,
শিশু আর পাখি আনিছে প্রভাত,
বড় হাত মোর কণ্ঠ জড়ায়,
ছোট হাতখানি
বুকে আসে—
পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল
কলভাষে।

আজি নিশা-শেষে এ কী সুমধুর
জাগরণ!
এ কী আঁখি-সুখ-আহরণ!

কচি অধরের হাসির কাকলি
কোন সুখে প্রাণ তুলিছে আকুলি'
রমণীর মুখে নূতন মহিমা—
নিমেষে টুটিল
আবরণ!
আজি নিশা-শেষে এ কী সুমধুর
জাগরণ!

ঘুম-ভাঙা আঁখি হেরিছে স্বপন
অনিমেষে—
স্বরগ-সুধার রসাবেশে!
প্রিয়া চেয়ে আছে শিশুর বয়ানে—
শিথিল বেণীটি লুটায় শিথানে,
ঝলমল করে হারখানি তার
পয়োধর-মূলে
স'রে এসে!—
মোর আঁখি আজ হেরিছে স্বপন
অনিমেষে।

বধূ ও জননী পিপাসা মিটায়
দ্বিধাহারা—
রাধা ও ম্যাডোনা একাকারা!
অধরে মদিরা, নয়নে নবনী,
এ কী অপরূপ রূপের লাবনি!
সুন্দর! তব এ কী ভোগবতী
মরম-পরশী
রসধারা!

বধূ ও জননী পিপাসা মিটায়
দ্বিধাহারা।

পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল
কলভাষে,
প্রিয়া বাঁধিয়াছে বাহুপাশে।
জনমে-জনম ওই বাহুপাশ,
শিশুকণ্ঠের ওই কলভাষ,
বাঁধিয়াছে জানি গাঁটছড়াখানি
দ্বিগুণ করিয়া
দৃঢ়-ফাঁসে—
তাই ধরা পড়ি এই ধরণীর
বাহুপাশে।

৩৪. স্বপ্ন নহে

স্বপ্নহীন রাতি মোর। কৃষ্ণা-তিথি যবে,
না-উদিতে জ্যোৎস্না আমি ঘুমাইয়া পড়ি;
অর্ধরাত্রে শয্যা-'পরে উঠি ধড়মড়ি'
শুনি, কে ডাকিছে যেন মৃদু আর্তরবে!
শীর্ণ দ্বাদশীর চন্দ্র হেরি নিম্ন-নভে,
বায়ুশ্বাসে ছায়া যত উঠিতেছে নড়ি',
সহসা উঠিল বাজি' দূরে কোথা ঘড়ি—
কই, কোথা?—কেহ নাই! বুঝি স্বপ্ন হবে!

স্বপ্ন নহে; ছায়ালোকে, এই স্তব্ধ ক্ষণে
অশরীরী ফিরে পায় শব্দের শরীর—
গান যথা ধরা দেয় অ-ধর অধীর

কবির মনের মায়া! নিদ্রা-অচেতনে
কর্ণে তব স্পর্শ লভি শুধু কণ্ঠস্বনে,
তার বেশি চাওয়া বৃথা—বারণ বিধির!

সুধীরকুমার রায়চৌধুরী

(জ. ১৮৯৭)

৩৫. একটি নিমেষ

আজি এ-নিমেষখানি উতরিলো এসে চুপে-চুপে,
কী নিবিড় পূর্ণতার রূপে
নিভৃত এ-হৃদিতটে এসে।
বুকে নিয়ে এলো ভালোবেসে
অসীমের যত পণ্য। অনাদির যত আয়োজন,
একটি নিমেষ-বৃন্তে ফুটি উঠি ফুলের মতন
রহিয়াছে স্থির,
অন্তহারা তপোনিষ্ঠা বারে-বারে ফুটিছে সৃষ্টির,
নিতল এ-নভোতলে শরতের মেঘ-আলিপন,
নত করবীর শাখা, রৌদ্র-দীপ্ত গৃহের প্রাঙ্গণ,
নিদ্রাতুর সারমেয়, উড়ে-যাওয়া চিলের ছায়াটি,
পাতা-খোলা বইখানা, কাপড় কোঁচানো পরিপাটি,
কিছু নহে মিছে—
স্নেহভরা কার দুটি নয়নে জাগিছে
সবে এরা।
পথে পথিকের চলাফেরা,
ও-বাড়িতে ছেলেদের সুর ক'রে ধারাপাত শেখা,
এরও লাগি অনাদির যুগে-যুগে কত স্বপ্ন দেখা,
অধীর প্রতীক্ষা কত কল্প-কল্প ধ'রে!
তরুতলে পাতার মর্মরে,

গাড়ির চাকার শব্দে, কামারের হাতুড়ির ঘায়
নারীর কলহে আর শিশুর কান্নায়
ধ্বনিতেছে যেই মূরছনা,
তারে ছেড়ে কোনোমতে চলিতো না,
এ-বিশ্বের সংগীত-সাধন,
ব্যর্থ হ'য়ে যেতো তার যুগান্তের যত আয়োজন।

পরিপূর্ণ একটি নিমেষে
নিজেরে হেরিনু পরিপূর্ণতার রাজরাজ-বেশে।
আমি আছি—চূড়ান্ত এ-অধিকারে গনি,
আমি বিশ্ব-দেবতার নয়নের মণি।

নজরুল ইসলাম (জ. ১৮৯৯)

৩৬. প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়

যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়।
যায় অতীত
কৃষ্ণকায়
যায় অতীত
রক্তপায়—
যায় মহাকাল মূর্ছা যায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়!
যায় প্রবীণ
চৈতীবায়
আয় নবীন
শক্তি আয়!

যায় অতীত,
যায় পতিত,
'আয় অতিথ',
আয়রে আয়—'
বৈশাখী ঝড় স্বর হাঁকায়—
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়,
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়!
ঐ রে দিক-
চক্রে কার
বক্র পথ
ঘুর-চাকার।
ছুটছে রথ
চক্র ঘায়
দিগ্বিদিক
মূর্চ্ছা যায়!
কোটি রবি শশী ঘুর পাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়,
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়!

ঘোরে গ্রহ তারা পথ-বিভোল,—
"কাল"-কোলে "আজ" খায় রে দোল!
আজ প্রভাত
আনছে কা'য়,
দূর পাহাড়-
চূড় তাকায়।
জয়-কেতন
উড়ছে কার
কিংশুকের
ফুল-শাখায়।

ঘুরছে রথ,
রথ-চাকায়
রক্ত-লাল
পথ আঁকায়।
জয়-তোরণ
রচছে কার
ঐ ঊষার
লাল আভায়,
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়,
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়!

গর্জে ঘোর
ঝড় তুফান,
আয় কঠোর
বর্তমান।
আয় তরুণ,
আয় অরুণ,
আয় দারুণ,
দৈন্যতায়!
ভয় কি আয়।
ঐ মা অভয়-হাত দেখায়
রামধনুর
লাল শাঁখায়!
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়,
প্রবর্তকের ঘুর-চাকায়!

বর্ষ-সতী-স্কন্ধে ঐ
নাচছে কাল
থৈ তা থৈ!

কই সে কই
চক্রধর,
ঐ মায়ায়
খণ্ড কর
শব-মায়ায়
শিব যে যায়
ছিন্ন কর
ঐ মায়ায়—
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায় !

৩৭. শিকল-পরার গান

এই শিকল-পরা ছল মোদের এ
শিকল-পরা ছল।
এই শিকল প'রেই শিকল তোদের
করব রে বিকল ॥
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হ'তে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল ॥

তোমরা বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে
করছ বিশ্ব গ্রাস।
আর ত্রাস দেখিয়েই করবে ভাবছো
বিধির শক্তি হ্রাস ॥
সেই ভয়-দেখানো ভূতের মোরা করব সর্বনাশ ;
এবার আনবো মাভৈঃ-বিজয়-মন্ত্র বলহীনের বল ॥

তোমরা ভয় দেখিয়েই করছ শাসন,
জয় দেখিয়ে নয়।
সেই ভয়ের টুঁটি ধরব টিপে
করব পরে লয়॥
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আনব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি প'রে আনব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই
শিকল-ঝঞ্ঝনা।
এ যে মুক্তি-পথের অগ্রদূতের
চরণ-বন্দনা!
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল॥

৩৮. অভিশাপ

আমি বিধির বিধান ভাঙিয়াছি আমি এমনই শক্তিমান।
মম চরণের তলে মরণের মার খেয়ে মরে ভগবান!
আদি ও অন্তহীন
আজ মনে পড়ে সেই দিন—
প্রথম যেদিন আপনার মাঝে আপনি জাগিনু আমি,
আর চীৎকার করি' কাঁদিয়া উঠিল তোদের জগৎস্বামী!
ভয়ে কালো হ'য়ে গেল আলো-মুখ তার।
ফরিয়াদ করি' গুমরি' উঠিল মহা হাহাকার—
ছিন্ন কণ্ঠে আর্তকণ্ঠে তোমাদের ঐ ভীরু বিধাতার—
আর্তনাদের মহা হাহাকার—
'বাঁচাও আমারে বাঁচাও হে মোর মহান বিপুল আমি!

হে মোর স্বষ্টি! অভিশাপ মোর!
আজি হ'তে প্রভু তুমি হও মম স্বামী!'
শুনি' খলখলখল অট্ট হাসিনু, আজিও সে-হাসি বাজে
ঐ অগ্ন্যুদ্‌গার-উল্লাসে আর নিদাঘ-দগ্ধ
বিনা মেঘে ওই শুষ্ক বজ্র মাঝে—
স্রষ্টার বুকে আমি সেই দিন প্রথম জাগানু ভীতি,—
সেই দিন হ'তে বাজিছে নিখিলে ব্যথা-ক্রন্দন-গীতি!
ঝাপটি ধরিয়া বিধাতারে আজো পিষে মারি পলে পলে
এই কালসাপ আমি, লোকে ভুল ক'রে মোরে অভিশাপ বলে

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪।)

৩৯. পাখিরা

ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে—
বসন্তের রাতে
বিছানায় শুয়ে আছি;
—এখন সে কত রাত!
ঐ দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।
তার পর চ'লে যায় কোথায় আকাশে?
তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে।

শরীরে এসেছে স্বাদ বসন্তের রাতে,
চোখ আর চায় না ঘুমাতে;
জানালার থেকে অই নক্ষত্রের আলো নেমে আসে,
সাগরের জলের বাতাসে
আমার হৃদয় সুস্থ হয়;

সবাই ঘুমায়ে আছে সব দিকে,—
সমুদ্রের এই ধারে কাহাদের নোঙরের হয়েছে সময় ?

সাগরের ঐ পারে—আরো দূর পারে
কোনো-এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখি ছিলো ;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে-দলে সমুদ্রের 'পর
নেমেছিলো তারা তারপর,
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে !
বাদামি—সোনালি—শাদা—ফুটফুট ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোটো বুকে
তাদের জীবন ছিলো—
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ-লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হ'য়ে !

কোথাও জীবন আছে,—জীবনের স্বাদ রহিয়াছে,
কোথাও নদীর জল র'য়ে গেছে—সাগরের তিতা ফেনা নয়।
খেলার বলের মতো তাদের হৃদয়
এই জানিয়াছে ;
কোথাও রয়েছে প'ড়ে শীত পিছে, আশ্বাসের কাছে
তারা আসিয়াছে।

তারপর চ'লে যায় কোন-এক খেতে
তাহার প্রিয়ের সাথে আকাশের পথে যেতে-যেতে
সে কি কথা কয় ?
তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময় !

অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের, পাওয়া গেছে এ-মাটির ঘ্রাণ
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান,

আর সেই নীড়,
এই স্বাদ—গভীর—গভীর!

আজ এই বসন্তের রাতে
ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে;
ঐ দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।

৪০. অবসরের গান

(অংশ)

শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের খেতে;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার—চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান,
দেহের স্বাদের কথা কয়;
বিকালের আলো এসে (হয়তো বা) নষ্ট ক'রে দেবে তার সাধের সময়।
চারিদিকে এখন সকাল—
রোদের নরম রং শিশুর গালের মতো লাল;
মাঠের ঘাসের 'পরে শৈশবের ঘ্রাণ—
পাড়াগাঁর পথে ক্ষান্ত উৎসবের এসেছে আহ্বান।

চারিদিকে নুয়ে প'ড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা-ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল;
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে-থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে!
শরীর এলায়ে আসে এইখানে ফলন্ত ধানের মতো ক'রে,
যেই রোদ একবার এসে শুধু চ'লে যায় তাহার ঠোঁটের চুমো ধ'রে

আহ্লাদের অবসাদে ভ'রে আসে আমার শরীর,
চারিদিকে ছায়া—রোদ—খুদ—কুঁড়ো—কার্তিকের ভিড় ;
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ।

আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
বিয়োবার দেরি নাই—রূপ ঝ'রে পড়ে তার—
শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে ;
আজো তবু ফুরায়নি বৎসরের নতুন বয়স,
মাঠে-মাঠে ঝ'রে পড়ে কাঁচা রোদ—ভাঁড়ারের রস।
মাছির গানের মতো অনেক অলস শব্দ হয়
সকালবেলার রৌদ্রে ; কুঁড়েমির আজিকে সময়।

গাছের ছায়ার তলে মদ ল'য়ে কোন ভাঁড় বেঁধেছিলো ছড়া !
তার সব কবিতার শেষ পাতা হবে আজ পড়া ;
ভুলে গিয়ে রাজ্য—জয়—সাম্রাজ্যের কথা
অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিলো তুলে নেবো তার শীতলতা ;
ডেকে নেবো আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের সব ;
মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে—
শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।

হাতে হাত ধ'রে-ধ'রে গোল হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে
কার্তিকের মিঠে রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে ;
ফলন্ত ধানের গন্ধে—রঙে তার—স্বাদে তার ভ'রে যাবে আমাদের সকলের দেহ ;
রাগ কেহ করিবে না—আমাদের দেখে হিংসা করিবে না কেহ।
আমাদের অবসর বেশি নয়—ভালোবাসা আহ্লাদের অলস সময়
আমাদের সকলের আগে শেষ হয় ;
দূরের নদীর মতো সুর তুলে অন্য এক ঘ্রাণ—অবসাদ—
আমাদের ডেকে লয়, তুলে লয় আমাদের ক্লান্ত মাথা, অবসন্ন হাত।

তখন শস্যের গন্ধ ফুরায়ে গিয়েছে খেতে—রোদ গেছে প'ড়ে,
এসেছে বিকালবেলা তার শান্ত শাদা পথ ধ'রে ;
তখন গিয়েছে থেমে ওই কুঁড়ে গেঁয়োদের মাঠের রগড় ;
হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালির বিছানার 'পর ;
মদের ফোঁটার শেষ হ'য়ে গেছে এ-মাঠের মাটির ভিতর ;
তখন সবুজ ঘাস হ'য়ে গেছে শাদা সব, হ'য়ে গেছে আকাশ ধবল,
চ'লে গেছে পাড়াগাঁর আইবুড়ো মেয়েদের দল !

৪১. বোধ

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—কোন এক বোধ কাজ করে ;
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয় !
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে ;
সব কাজ তুচ্ছ হয়,—পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয় !

সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে !
কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে
সহজ লোকের মতো ; তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর !—কোনো নিশ্চয়তা
কে জানিতে পারে আর ? শরীরের স্বাদ
কে বুঝিতে চায় আর ?—প্রাণের আহ্লাদ

সকল লোকের মতো কে পাবে আবার !
সকল লোকের মতো বীজ বুনে আর
স্বাদ কই !—ফসলের আকাঙ্ক্ষায় থেকে,
শরীরে মাটির গন্ধ মেখে,
শরীরে জলের গন্ধ মেখে,
উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে
চাষার মতন প্রাণ পেয়ে
কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর 'পরে ?
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—কোন এক বোধ কাজ করে
মাথার ভিতরে।

পথে চ'লে পারে—পারাপারে
উপেক্ষা করিতে চাই তারে ;
মড়ার খুলির মতো ধ'রে
আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে
তবু সে মাথার চারিপাশে,
তবু সে চোখের চারিপাশে,
তবু সে বুকের চারিপাশে ;
আমি চলি, সাথে-সাথে সেও চ'লে আসে।

আমি থামি—
সেও থেমে যায় ;

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা ?
আমার পথেই শুধু বাধা ?

জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মতো হ'য়ে—
সন্তানের জন্ম দিতে-দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিংবা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের ; কিংবা যারা পৃথিবীর বীজক্ষেতে আসিতেছে চ'লে
জন্ম দেবে—জন্ম দেবে ব'লে ;
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি ? তাহাদের মন
আমার মনের মতো না কি ?
—তবু কেন এমন একাকী ?
তবু আমি এমন একাকী !

হাতে তুলে দেখিনি কি চাষার লাঙল ?
বাল্‌টিতে টানিনি কি জল ?
কাস্তে হাতে কতবার যাইনি কি মাঠে ?
মেছোদের মতো আমি কত নদী ঘাটে
ঘুরিয়াছি ;
পুকুরের পানা শ্যালা—আঁশটে গায়ের ঘ্রাণ গায়ে
গিয়েছে জড়ায়ে ;
—এই সব স্বাদ ;
—এ-সব পেয়েছি আমি ; বাতাসের মতন অবাধ
বয়েছে জীবন,
নক্ষত্রের তলে শুয়ে ঘুমায়েছে মন
এক দিন ;
এই সব সাধ
জানিয়াছি একদিন—অবাধ—অগাধ ;
চ'লে গেছি ইহাদের ছেড়ে ;

ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা ক'রে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে ;

আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা ক'রে চ'লে গেছে—যখন ডেকেছি বারে-বারে
ভালোবেসে তারে ;
তবুও সাধনা ছিলো একদিন—এই ভালোবাসা ;
আমি তার উপেক্ষার ভাষা
আমি তার ঘৃণার আক্রোশ
অবহেলা ক'রে গেছি ; যে-নক্ষত্র—নক্ষত্রের দোষ
আমার প্রেমের পথে বার-বার দিয়ে গেছে বাধা
আমি তা ভুলিয়া গেছি ;
তবু এই ভালোবাসা—ধুলো আর কাদা— ।

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে ।

আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে :
সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয় !
অবসাদ নাই তার ? নাই তার শান্তির সময় ?
কোনোদিন ঘুমাবে না ? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে না কি ? পাবে না আহ্লাদ
মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন !

মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন !
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন !

এই বোধ—শুধু এই স্বাদ
পায় সে কি অগাধ—অগাধ !
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে ? করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষীর মুখ ?
দেখিবে সে মানুষের মুখ ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ ?
চোখে কালোশিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব।

৪২. ঘাস

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভ'রে গিয়েছে এই ভোরের বেলা ;
কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।
আমারও ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাশে-গেলাশে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতরে ঘাস হ'য়ে জন্মাই কোনো-এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

৪৩. নগ্ন নির্জন হাত

আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হ'য়ে উঠছে :
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।
যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে,
অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি,
সেই নারীর মতো
ফাল্গুন-আকাশে অন্ধকার নিবিড় হ'য়ে উঠছে।

মনে হয় কোনো বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।

ভারত-সমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো-এক নগরী ছিলো একদিন,
কোনো-এক প্রাসাদ ছিলো ;
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ :
পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি, নারী—
এই সব ছিলো সেই জগতে একদিন।

অনেক কমলা রঙের রোদ ছিলো,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিলো,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিলো অনেক ;

অনেক কমলা রঙের রোদ ছিলো,
অনেক কমলা রঙের রোদ ;
আর তুমি ছিলে ;

তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না,
খুঁজি না।

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু-রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায়-পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস,—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময় !

পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাশে তরমুজ মদ !
তোমার নগ্ন নির্জন হাত ;

তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

৪৪. হায়, চিল

হায়, চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে-উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে !
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে ;
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চ'লে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো ? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা
জাগাতে ভালোবাসে !
হায়, চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে-উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

৪৫. বনলতা সেন

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতি দূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে ছাখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

৪৬. সমারূঢ়

'বরং নিজেই তুমি লেখো নাকো একটি কবিতা—'
বলিলাম ম্লান হেসে ; ছায়াপিণ্ড দিলো না উত্তর ;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়—সে যে আরূঢ় ভণিতা :
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের 'পর
ব'সে আছে সিংহাসনে—কবি নয়—অজর, অক্ষর

অধ্যাপক ;—দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি ;
বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি ;
যদিও সে-সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিলো—হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি।

৪৭. বিড়াল

সারাদিন একটা বিড়ালের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে কেবলই আমার দেখা হয় :
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামি পাতার ভিড়ে ;
কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হ'য়ে আছে দেখি ;
কিন্তু তবুও তারপর কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে,
সারাদিন সূর্যের পিছনে চলেছে সে।
একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।
হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে-বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে ;
তারপর অন্ধকারকে ছোটো-ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনলো সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিলো।

৪৮. আট বছর আগের একদিন

শোনা গেলো লাসকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে ;
কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হ'লো তার সাধ।

বধূ শুয়ে ছিলো পাশে—শিশুটিও ছিলো ;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়,—তবু সে দেখিলো
কোন ভূত ? ঘুম কেন ভেঙে গেলো তার ?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমোয় এবার।

এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি !
রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার ;
কোনোদিন জাগিবে না আর।

'কোনোদিন জাগিবে না আর
জাগিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভার
সহিবে না আর—'
এই কথা বলেছিলো তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।

তবুও তো পেঁচা জাগে ;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইসারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা ;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি ;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি।

ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন—যেন কোনো বিকীর্ণ জীবন
অধিকার ক'রে আছে ইহাদের মন ;
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরন
মরণের সাথে লড়িয়াছে ;
চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা-একা ;
যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা
এই জেনে।
অশ্বত্থের শাখা
করেনি কি প্রতিবাদ ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি
ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করেনি কি মাখামাখি ?
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে
বলেনি কি : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে
চমৎকার !—
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার !'
জানায়নি পেঁচা এসে এ-তুমুল গাঢ় সমাচার ?

জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হ'লো ;—
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে—গুমোটে—
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে।

শোনো
তবু এ মৃতের গল্প ; কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই ;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ,

সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ
মধু—আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে ;
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ-জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই ;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে,
চোখ পাল্টায়ে কয় : 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে ?
চমৎকার !
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার—'

হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার?
আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো—বুড়ি চাঁদটারে আমি
ক'রে দেবো কালীদহে বেনোজলে পার;
আমরা দু-জনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের
প্রচুর ভাঁড়ার।

৪৯. **আদিম দেবতারা**

আগুন বাতাস জল: আদিম দেবতারা তাদের সর্পিল পরিহাসে
তোমাকে দিলো রূপ—
কী ভয়াবহ নির্জন রূপ তোমাকে দিলো তারা;
তোমার সংস্পর্শের মানুষদের রক্তে দিলো মাছির মতো কামনা।

আগুন বাতাস জল: আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
আমাকে দিলো লিপি রচনা করবার আবেগ:
যেন আমিও আগুন বাতাস জল,
যেন তোমাকেও সৃষ্টি করছি।

তোমার মুখের রূপ যেন রক্ত নয়, মাংস নয়, কামনা নয়,
নিশীথ-দেবদারু-দ্বীপ;
কোনো দূর নির্জন নীলাভ দ্বীপ;

স্থূল হাতে ব্যবহৃত হ'য়ে তবু
তুমি মাটির পৃথিবীতে হারিয়ে যাচ্ছো;
আমি হারিয়ে যাচ্ছি সুদূর দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়ার ভিতর।

আগুন বাতাস জল: আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
রূপের বীজ ছড়িয়ে চলে পৃথিবীতে,
ছড়িয়ে চলে স্বপ্নের বীজ।

অবাক হ'য়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি ?
রূপ কেন নির্জন দেবদারু-দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হ'য়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হ'য়ে—
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা হো-হো ক'রে হেসে উঠলো :
'ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হ'য়ে শূয়ারের মাংস হ'য়ে যায় ?'

হো-হো ক'রে হেসে উঠলাম আমি !—
চারদিককার অট্টহাসির ভিতর একটা বিরাট তিমির মৃতদেহ নিয়ে
অন্ধকার সমুদ্র স্ফীত হ'য়ে উঠলো যেন ;
পৃথিবীর সমস্ত রূপ অমেয় তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধের মতো,
যেখানেই যাই আমি সেই সব সমুদ্রের উল্কায়-উল্কায়
কেমন স্বাভাবিক, কী স্বাভাবিক !

৫০. আকাশলীনা

সুরঞ্জনা, ঐখানে যেয়ো নাকো তুমি,
বোলো নাকো কথা ঐ যুবকের সাথে ;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা :
নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে ;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে ;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার ;
দূর থেকে দূরে—আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়ো নাকো আর।

কী কথা তাহার সাথে ? তার সাথে !
আকাশের আড়ালে আকাশে

মৃত্তিকার মতো তুমি আজ :
তার প্রেম ঘাস হ'য়ে আসে।

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস :
বাতাসের ওপারে বাতাস—
আকাশের ওপারে আকাশ।

৫১. যেই সব শেয়ালেরা

যেই সব শেয়ালেরা জন্ম-জন্ম শিকারের তরে
দিনের বিশ্রুত আলো নিভে গেলে পাহাড়ের বনের ভিতরে
নীরবে প্রবেশ করে,—বার হয়,—চেয়ে দেখে বরফের রাশি
জ্যোৎস্নায় প'ড়ে আছে ;—উঠিতে পারিতো যদি সহসা প্রকাশি'
সেই সব হৃদ্‌যন্ত্র মানবের মতো আত্মায় :
তাহ'লে তাদের মনে যেই এক বিদীর্ণ বিস্ময়
জন্ম নিতো ;—সহসা তোমাকে দেখে জীবনের পারে
আমারও নিরভিসন্ধি কেঁপে ওঠে স্নায়ুর আঁধারে।

৫২. রাত্রি

হাইড্র্যাণ্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল ;
অথবা সে-হাইড্র্যাণ্ট হয়তো বা গিয়েছিলো ফেঁসে।
এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেলো কেশে

অস্থির পেট্রল ঝেড়ে ;—সতত সতর্ক থেকে তবু
কেউ যেন ভয়াবহভাবে প'ড়ে গেছে জলে।
তিনটি রিকশ ছুটে গেলো শেষ গ্যাস-ল্যাম্পে
মায়াবীর মতো জাদুবলে।

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকারিতায়
মাইল-মাইল পথ হেঁটে—দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে গিয়ে—টেরিটি বাজারে ;
চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।

মদির আলোর তাপ চুমো খায় গালে।
কেরোসিন কাঠ, গালা, গুণচট, চামড়ার ঘ্রাণ
ডাইনামোর গুঞ্জনের সাথে মিশে গিয়ে
ধনুকের ছিলা রাখে টান।

টান রাখে মৃত ও জাগ্রৎ পৃথিবীকে।
টান রাখে জীবনের ধনুকের ছিলা।
শ্লোক আওড়ায়ে গেছে মৈত্রেয়ী কবে ;
রাজ্য জয় ক'রে গেছে অমর আত্তিলা।

নিতান্ত নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে
গান গায় আধো জেগে ইহুদি রমণী ;
পিতৃলোক হেসে ভাবে, কাকে বলে গান—
আর কাকে সোনা, তেল, কাগজের খনি।

ফিরিঙ্গি যুবক কটি চ'লে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে ;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার ক'রে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব,—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

৫৩. সুদর্শনা

একদিন ম্লান হেসে আমি
তোমার মতন এক মহিলার কাছে
যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হ'তে গিয়ে
অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে
শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে,
দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।

সব চেয়ে আকাশ নক্ষত্র ঘাস চন্দ্রমল্লিকার রাত্রি ভালো ;
তবুও সময় স্থির নয় ;
আরেক গভীরতর শেষ রূপ চেয়ে
দেখেছে সে তোমার বলয়।

এই পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন
তোমার শরীর ; তুমি দান করো নি তো ;
সময় তোমাকে সব দান ক'রে মৃতদার ব'লে
সুদর্শনা, তুমি আজ মৃত।

৫৪. 'অদ্ভুত আঁধার এক'

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে ছাখে তারা ;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

৫৫. 'ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত'

ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত ধীরে
আমাদের দুজনকে নিতে চায় যেই শব্দহীন মাটি ঘাসে,
সাহস সংকল্প প্রেম আমাদের কোনোদিন সেদিকে যাবে না,
তবুও পায়ের চিহ্ন সেদিকেই চ'লে যায় কী গভীর সহজ অভ্যাসে।

৫৬. কার্তিকের ভোরবেলা

কার্তিকের ভোরবেলা
চোখে মুখে চুলের উপরে
যে-শিশির ঝরলো, তা
শালিক ঝরালো ব'লে ঝরে।

আমলকী গাছ ছুঁয়ে তিনটি শালিক
কার্তিকের রোদে আর জলে
আমার হৃদয় দিয়ে চেনা তিন নারীর মতন
সূর্য? না কি সূর্যের চপ্পলে

পা গলিয়ে পৃথিবীতে এসে
পৃথিবীর থেকে উড়ে যায়।
এ-জীবনে আমি ঢের শালিক দেখেছি,
তবু সেই তিনজন শালিক কোথায়।

৫৭. দুদিকে ছড়িয়ে আছে

দুদিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ,
মাঝখানে আজ এই সময়ের ক্ষণিকের আলো।
যে-নারীর মতো এই পৃথিবীতে কোনোদিন কেউ
নেই আর—সে এসে মনকে নীল—রৌদ্রনীল শ্যামলে ছড়ালো।

ভুলে গেছি পটভূমি—ভুলে গেছি কে যে সেই নারী,
আজকে হারিয়ে গেছে সব ;
চারিদিকে গুঞ্জরিত হয়েছিলো কী সব গভীর পল্লব।
যখনই আমার আত্মা বৃক্ষ আর আগুনের মতো নভোচারী
হ'য়ে ওঠে—মনে হয় যেন কোন হরিতের—নব হরিতের
সংগীতে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মানুষের ভাষা
হৃদয়ের আরো দূর জন্ম-জন্মান্তরে মুখোমুখি ফিরে এসে
অনাদি আলোর ভালোবাসা
সামাজিক অন্তহীন আকাশের নীচে
জালিয়ে শ্যামলনীল ব্যথা হ'তে চায়।
আমি সেই মহাতরু—লাবণ্যসাগর থেকে নিজে
জাগিয়েছো তুমি অনাদির সূর্য-নীলিমায়,
পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ ক'রে অবিনাশ স্বর
আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায়
অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)

৫৮. নাম

চাই, চাই, আজো চাই তোমারে কেবলি।
আজো বলি,
জনশূন্যতার কানে রুদ্ধ কণ্ঠে বলি আজো বলি—
অভাবে তোমার
অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার,
কাম্য শুধু স্থবির মরণ।
নিরাশ অসীমে আজো নিরপেক্ষ তব আকর্ষণ
লক্ষ্যহীন কক্ষে মোরে বন্দী ক'রে রেখেছে প্রেয়সী ;
গতি-অবসন্ন চোখে উঠিছে বিকশি'

অতীতের প্রতিভাস জ্যোতিষ্কের নিঃসার নির্মোকে।
আমার জাগর স্বপ্নলোকে
একমাত্র সত্তা তুমি, সত্য শুধু তোমারি স্মরণ॥

তবু মোর মন
চাহে নাই মোহের আশ্রয়।
জানি, তুমি মরীচিকা; তোমা সনে প্রাণবিনিময়
কোনোদিন হবে না আমার।
আমার পাতালমুখী বসুধার ভার,
জানি, কেহ পারিবে না ভাগ ক'রে নিতে;
আমারে নিঃশেষে পিষে, মিশে যাবে নিশ্চিহ্ন নাস্তিতে
একদিন স্বরচিত এ-পৃথিবী মম॥

জানি, ব্যর্থ, ব্যর্থ সেই সন্ধ্যা নিরুপম
যবে মোর আননে নেহারি
অগাধ নয়নে তব ফলদা স্বাতীর পুণ্য বারি
উঠেছিলো সহসা উচ্ছলি।
জানি সেই বনপথে, চিরাভ্যস্ত প্রেমনিবেদনে
আপনারে ছলি,
পশিনি তোমার মর্মে, নিজের গহনে
জমিয়েছিলাম শুধু মিথ্যার জঞ্জাল।
জানি, কত তরুণীর গাল
অমনি অধৈর্যভরে শত বার দিয়েছি রাঙায়ে;
অনুপূর্ব পথিকার পায়ে
বজ্রাহত অশোকেরে অলজ্জায় করেছি বিনত
ক্ষণিক পুষ্পের লোভে। ক্রমাগত
তাদের পদাঙ্ক মুছে গেছে রৌদ্রে ধারাপাতে, ঝড়ে;
যুগান্তরে
তোমার স্মৃতিও, জানি, সেই মতো হারাবে ধুলায়॥

তবু চায়, প্রাণ মোর তোমারেই চায়।
তবু আজ প্রেতপূর্ণ ঘরে
অদম্য উদ্বেগ মোর অব্যক্তেরে অমর্যাদা করে;
অনন্ত ক্ষতির সংজ্ঞা জপে তব পরাক্রান্ত নাম—
নাম—শুধু নাম—শুধু নাম॥

৫৯. শাশ্বতী

শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে
প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া;
স্বর্ণ সুযোগে লুকাচুরি-খেলা করে
গগনে-গগনে পলাতক আলো-ছায়া।
আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে;
হানে মৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধ্বনি:
মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে
মাঠে, ঘাটে, বাটে আরব্ধ আগমনী।
কুহেলিকলুষ দীর্ঘ দিনের সীমা
এখনই হারাবে কৌমুদীজাগরে যে;
বিরহবিজন ধৈর্যের ধূসরিমা
রঞ্জিত হবে দলিত শেফালিশেজে।
মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকি,
নবান্নে তার আসন রয়েছে পাতা:
পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি;
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা॥

একদা এমনই বাদলশেষের রাতে—
মনে হয় যেন শত জনমের আগে—
সে এসে সহসা হাত রেখেছিলো হাতে,
চেয়েছিলো মুখে সহজিয়া অনুরাগে;

সে-দিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিলো তার চিকুরের পাকা ধানে ;
অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিলো তার আনত দিঠির মানে।
একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিলো সাতটি অমরাবতী ;
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে,
থামিলো কালের চিরচঞ্চল গতি ;
একটি পণের অমিত প্রগল্ভতা
মর্তে আনিলো ধ্রুবতারকারে ধ'রে ;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ দিলো অবারিত ক'রে ॥

সন্ধিলগ্ন ফিরেছে সগৌরবে ;
অধরা আবার ডাকে সুধাসংকেতে ;
মদমুকুলিত তারই দেহসৌরভে
অনামা কুসুম অজানায় ওঠে মেতে।
ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,
অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে ;
অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি ;
দিব্য শিশিরে তারই স্বেদ অভিষেকে।
স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখিসম ;
সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে-ঘাসে ;
পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম ;
আজ সে কেবল আর কারে ভালোবাসে।
স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা ;
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিবো না, আমি কভু ভুলিবো না ॥

৬০. উটপাখি

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি ?
কেন মুখ গুঁজে আছো তবে মিছে ছলে ?
কোথায় লুকোবে ? ধু-ধু করে মরুভূমি ;
ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই ;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
নিষাদের মন মায়ামৃগে ম'জে নেই ;
তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ।
কোথায় পালাবে ? ছুটবে বা আর কত ?
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা।
প্রাক্‌পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা॥

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে ?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে ?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।
তার চেয়ে আজ আমার যুক্তি মানো,
সিকতাসাগরে সাধের তরণী হও ;
মরুদ্বীপের খবর তুমিই জানো,
তুমি তো কখনো বিপদপ্রাজ্ঞ নও।
নব সংসার পাতি গে আবার, চলো
যে-কোনো নিভৃত কণ্টকাবৃত বনে।
মিলবে সেখানে অন্তত নোনা জলও,
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে॥

কল্পলতার বেড়ার আড়ালে সেথা
গ'ড়ে তুলবো না লোহার চিড়িয়াখানা ;

ডেকে আনবো না হাজার-হাজার ক্রেতা
ছাঁটতে তোমার অনাবশ্যক ডানা।
ভূমিতে ছড়ালে অকারী পালকগুলি
শ্রমণশোভন বীজন বানাবো তাতে ;
উধাও তারার উড্ডীন পদধূলি
পুঙ্খে-পুঙ্খে খুঁজবো না অমারাতে।
তোমার নিবিদে বাজাবো না ঝুমঝুমি,
নির্বোধ লোভে যাবে না ভাবনা মিশে ;
সে-পাড়াজুড়ানো বুলবুলি নও তুমি
বর্গীর ধান খায় যে উনতিরিশে ॥

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দুজনে সমান অংশীদার ;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের 'পরে দেনা শোধবার ভার।
তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি।
অন্ধ হ'লে কি প্রলয় বন্ধ থাকে ?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি।
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।
অতএব এসো আমরা সন্ধি ক'রে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি :
তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে,
তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাঁধি ॥

৬১. নরক

অন্ধকারে নাহি মিলে দিশা ॥

দীর্ঘায়িত নিশা
বয়োস্ফীত বারাঙ্গনা-পারা
দুর্গম তীর্থের পথে হ'য়ে সঙ্গীহারা

ঘুমায়ে পড়েছে যেন আতিথেয় অজানার পাশে
দুর্মর অভ্যাসে।
কেশকীটে ভরা তার মাথা
লুটায় আমার কাঁধে, পরনের শতচ্ছিদ্র কাঁথা
বিষায় জীবনবায়ু সংকীর্ণ কুটিরে,
তাহার বিক্ষিপ্ত বাহু ধরিয়াছে মোর কণ্ঠ ঘিরে,
ক্ষণে-ক্ষণে
অজ্ঞাত দুঃস্বপ্ন তার সন্ত্রস্ত কম্পনে
সঞ্চারিত হয় মোর জাতিস্মর অবচেতনায়॥

অতন্দ্রিত চক্ষু কিছু দেখিতে না পায়;
শুধু মোর সংকুচিত কায়া
অনুভব করে যেন নামহীন কাহাদের ছায়া
শিয়রে সংহত হ'য়ে উঠে;—
কোন যাদুঘর হ'তে দলে-দলে পাশে এসে জুটে
অবলুপ্ত পশুদের ভূত
কুৎসিত, অদ্ভুত।
অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা হানি', নিরাকার লজ্জা অসন্তোষ,
অসিদ্ধ দুরাশা দম্ভ, নিষ্ফল আক্রোশ
কানাকানি করে অন্তরালে।
রন্ধ্রহীন বিস্মৃতির প্রতন পাতালে
অতিক্রান্ত বিলাসের, অস্থাবর প্রমোদের শব
অনুর্বর সাম্প্রতেরে করিবারে চায় পরাভব
জোগায়ে জীয়নরস অপুষ্পক বীজে॥

অয়ি মনসিজে,
কোথা তুমি কোথা আজ এই স্থূল শরীরী নিশীথে?
তোমার অতল, কালো, অতনু আঁখিতে
তারকার হিম দীপ্তি ভ'রে
তাকাও আমার মুখে। অনাত্মীয় অসিত অম্বরে

এলাও অস্পৃশ্য কেশ সূক্ষ্ম, নিরুপম,
স্বপ্নস্বচ্ছ বরাভয়ে আত্মত্যাগী বেরেনিকে-সম।
হেমন্ত হাওয়ার নিমন্ত্রণে
অনঙ্গ আত্মারে মোর ডাক দাও নীহারশয়নে
দুস্তর নাস্তির পরপারে ;
দাঁড়ায়ে যে-নির্বাণের নির্লিপ্ত কিনারে
নিরুদ্বেগ নচিকেতা দেখেছিলো অধোমুখে চাহি
সম্ভোগরাত্রির শেষে ফেনিল সাগরে অবগাহি
কষিতকাঞ্চনকান্তি নগ্ন বসুন্ধরা
তারই প্রলোভনতরে সাজায়িছে যৌবনপসরা
রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে, কামাতুর রামার সমান,
হে বৈদেহী, করো মোরে সেখানে আহ্বান॥

পণ্ডশ্রম, নাহি মিলে সাড়া ;
শূন্যতার কারা
অগোচর অবরোধে ঘিরে মোর আর্ত মিনতিরে ;
যতই পলাতে চাই অভেদ্য তিমিরে
মাথা ঠুকে রক্তপঙ্কে পড়ি,
অগ্রজের মৃতদেহ যায় গড়াগড়ি
ক্রিমিভোগ্য দুর্গন্ধে যেখানে,
চরে যেথা ক্ষয়স্তূপে ভোজ্যের সন্ধানে
ক্লেদপুষ্ট সরীসৃপ, স্বেদস্রাবী বক্র বিষধর,
পঙ্কিল মণ্ডূক আর মূষিক তস্কর,
বজ্রনখ পেচক, বাদুড়॥

বমনবিধুর
আমার অনাত্ম্য দেহ প'ড়ে আছে মৃন্ময় নরকে।
মৌন নিরালোকে
ভুঞ্জে তারে খুশিমতো গৃধ্র নিশাচর।

দুস্তর, দুস্তর, জানি, শাস্তি মোর দুঃসহ, দুস্তর।
মনে হয় তাই
আত্মরক্ষা হাস্যকর, সুসংকল্প মৌখিক বড়াই,
জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,
নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্ভাব।
মানসীর দিব্য আবির্ভাব,
সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী ;
তাহার বিখ্যাত রাখি,
সে নহে মঙ্গলসূত্র, কেবল কুটিল নাগপাশ ;
মলময় তাহার উচ্ছ্বাস
বোনে শুধু ঊর্ণাজাল অসতর্ক মক্ষিকার পথে ॥

অমেয় জগতে
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ ;
মানুষের মর্মে-মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট ;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।
অতএব পরিত্রাণ নাই।
যন্ত্রণাই
জীবনে একান্ত সত্য, তারই নিরুদ্দেশে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে ॥

ব্যাপ্ত মোর চতুর্দিকে অনন্ত অমার পটভূমি ;
সবই সেথা বিভীষিকা, এমনকি বিভীষিকা তুমি ॥

৬২. প্রার্থনা

হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা,
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস।

যেন পূর্বপুরুষের মতো
আমিও নিশ্চিন্তে ভাবি ক্রীত, পদানত,
তুমি মোর আজ্ঞাবাহী দাস।
তাদের সমান
মণ্ডূকের কূপে মোরে চিরতরে রাখো, ভগবান।
কমঠবৃত্তির অহংকারে
ঢাকো ক্ষণভঙ্গুরতা। তাদের দৃষ্টান্ত-অনুসারে
আমিও ধরাকে যেন সরা জ্ঞান করি।
মর্যাদার ছিদ্রিত গাগরি
জোড়ে যেন বারংবার ডুবে আত্মপ্রসাদের স্রোতে।
রৌদ্র-জ্যোতি হ'তে
আবার ফিরাও মোরে তমসার প্রত্ন দায়ভাগে।
ঘুণধরা হাড়ে যেন লাগে
উঞ্ছপুষ্ট জ্যেষ্ঠদের তৈলসিক্ত মেদ;
মরে যেন উদ্বন্ধনে অপজাত হৃদয়ের খেদ॥

পিতৃপিতামহদের প্রায়
তোমার নামের গুণে তীর্ণ হ'য়ে দশম দশায়
মূঢ়, মূক গড্ডলেরে দিই যেন বলি
রক্তপিপাসিত যূপে।
বাচাল বিদ্রূপে
হুংকারিলে দুর্বৃত্তের উদ্ধত দম্ভোলি,
গুরুজনদের মতো করি যেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম
শক্তির উচ্চল পায়ে; আর্তির সংক্রাম
কেটে গেলে কালক্রমে জনাকীর্ণ রাজপথ থেকে,
স্ফীত বুকে অপ্রতিষ্ঠ পৌরুষেরে ঝেড়ে,
হাসিমুখে হাত নেড়ে
পলাতক সধর্মীরে ডেকে,
প্রমাণিতে পারি যেন সবই তব ইচ্ছা, ইচ্ছাময়॥

এলে পরে লাভের সময়,
সদসৎনির্বিচারে, সকলই তোমার দান ব'লে,
নিঃস্বের স্বেদাক্ত কড়ি হাতায়ে কৌশলে
আমিও জমাই যেন যক্ষসংরক্ষিত কোষাগারে।
শ্রুতিধর মান্ধাতার উক্তির উদ্ধারে
লুকায়ে ইন্দ্রিয়াসক্তি ; অবিমৃশ্য জন্মের জঞ্জালে
বিষায়ে সংকীর্ণ সৌধ ; জলে, স্থলে, নভে
বিরোধের বীজ বুনে ; নিরন্তর নিষ্কাম প্রসবে
ভগ্নস্বাস্থ্য গর্ভিণীর ক্লিন্ন অন্তকালে,
তোমার প্রতিভূ সেজে, উন্নরক স্বর্গের আশ্বাসে
সাধ্বীর সদ্‌গতি যেন করি।
উর্ধ্বশ্বাস উৎসবের উদ্বায়ী উচ্ছ্বাসে
তোমারে পাসরি',
দারুণ দুর্দিনে যেন পূজা মেনে বিস্ময়ে শুধাই,
"স্মরণে কি নাই,
দয়াময়, আশ্রিতেরে স্মরণে কি নাই ?"

ভগবান, ভগবান,
অতীতের অলীক, আত্মীয় ভগবান,
অভিব্যাপ্ত আবির্ভাবে আজ
আমার স্বতন্ত্র শূন্যে করো তুমি আবার বিরাজ।
শকুনির ক্ষুধানিবারণে
শস্যশ্যাম কুরুক্ষেত্রে মায়াবাদ ভ'নে,
সূচ্যগ্রমেদিনীলোভী যুযুৎসুরে ক্ষমিতে শেখাও
অপরের অপঘাত। তুলে নাও,
আমার রথাশ্বরজ্জু, হে সারথি, তুলে নাও হাতে।
স্বার্থের সংঘাতে
বিতর্ক, বিচার হানো। মর্মে-মর্মে, মজ্জায়-মজ্জায়
জাগাও অন্যায়, শাঠ্য। হিংস্র অলজ্জায়

পুণ্যশ্লোক সগোত্রের তুল্য মূল্য দাও, দাও মোরে।
অপ্রকট সততার জোরে
আমার অন্তিম যাত্রা, অতিক্রমি' সুমেরুর বাধা,
হয় যেন নন্দনে সমাধা,
যেখানে প্রতীক্ষারত সুরসুন্দরীরা
সুকৃতির পুরস্কারে পাত্রে ঢেলে অমৃতমদিরা,
নীবিবন্ধ খুলে,
শুয়ে আছে স্বপ্নাবিষ্ট কল্পতরুমূলে ॥

কিন্তু যেথা সর্পিল নিষেধ
স্বপুচ্ছের উপজীব্যে সাধে আত্মবেদ
প্রমিতির বিষবৃক্ষে, অমিতির অচিন্ত্য অভাবে :
অন্তরঙ্গ জনতার নিবিড় সদ্‌ভাবে
হয়নি বাসোপযোগী অদ্যাবধি যে-নিস্তাপ মরু ;
পশুপতি বাজায়ে ডমরু
মোর গোষ্ঠীপতিদের নাচায়নি যার ত্রিসীমায় ;
নিরালম্ব নিরালোকে যেথা
দেব-দ্বিজ-প্রবঞ্চিত ত্রিশঙ্কু ঝিমায়,
মৌনের মন্ত্রণা শোনে মৃত্যুবিপ্রলব্ধ নচিকেতা ;
সেখানে আমার তরে বিছায়ো না অনন্ত শয়ান,
হে ঈশান,
লুপ্তবংশ কুলীনের কল্পিত ঈশান ॥

৬৩. সমাপ্তি

বরষাবিষণ্ণ বেলা কাটালাম উন্মন আবেশে।
জনশূন্য হৃদয়ের কবাট উদ্‌ঘাটি',
স্মরণের চলাচল করিলাম সহজ, সরল।
দৃষ্টিহারা নেত্রপাতে দেখিলাম সন্নত আকাশে
এইমতো আর-এক দিবসের ছবি।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টির বিলাপে
শুনিলাম সে-কণ্ঠের স্নেহসম্ভাষণ।
অর্গলিত বাতায়নে ঝটিকার নিরর্থ আক্রোশে
বিচ্ছেদবিধ্বস্ত হিয়া বাখানিলো ক্ষুব্ধ অক্ষমতা
নির্বিকার, নিরুত্তর, রুক্ষ বিধাতারে॥
এলো সন্ধ্যা রিক্তবরিষণ;
দিনান্তের মুমূর্ষু বর্তিকা
প্রাক্‌নির্বাপণ দীপ্তি প্রজ্বলিত করিলো সহসা
প্রাণের অন্তিম শক্তিব্যয়ে;
তার পর অন্তরে বাহিরে
অন্ধকার বিস্তারিলো শবপ্রাবরণী॥

মনে হ'লো আশা নাই
মনে হ'লো ভাষা নাই পিঞ্জরিত ব্যর্থতা বলার।
মনে হ'লো
সংকুচিত হ'য়ে আসে মরণের চক্রব্যূহ যেন।
মনে হ'লো রন্ধ্রচারী মূষিকের মতো
শটিত জঞ্জালকণা কুড়ায়েছি এত কাল ধ'রে
কৃপণের ভাণ্ডারে-ভাণ্ডারে;
এইবার ফুরায়েছে পালা,
ঘাতক যন্ত্রের কারা অবরুদ্ধ হ'লো অবশেষে;
এইবার উত্তোলিত সম্মার্জনীমূলে
পিষ্ট হবে অচিরাৎ অকিঞ্চন উঞ্ছবৃত্তি মম॥

৬৪. সংবর্ত

এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে।
প্রাদেশিক শ্যামলিমা যেই পাংশু সাধারণ্যে ঢাকে,
অমনই সে আসে,
রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি, অবচ্ছিন্ন স্মৃতির উদ্ভাসে

লাক্ষণিক,—নেত্রসার, কপোলপ্রধান
প্রাক্‌প্রচ্ছদ নটী যেন। সঙ্গে-সঙ্গে ঘোচে ব্যবধান
দৃশ্য ও দ্রষ্টার মধ্যে : ভুলে যাই
উত্তরচল্লিশ আমি ; উদ্‌গ্রীব হ'য়েও যদি চাই,
তবু গলকম্বলের থর
মুকুরের অধিকাংশ জোড়ে ; নতোদর
লুকায় পায়ের ডগা অধোমুখে ক্বচিৎ তাকালে ;
স্থানবিনিময় করে চাঁদিতে কপালে,
চুলের প্রলেপ ওড়ে নামমাত্র বাতাসে যখন।
বীমাই জীবন
বুঝি বটে, কিন্তু ঠিক মাসে-মাসে কিস্তির যোগান
দিতে গিয়ে বাজারখরচে পড়ে টান।
অথচ ডাক্তারে বলে তন্তুক্ষয়
এ-বয়সে নিতান্ত নিশ্চয় ;
পুষ্টিকর পথ্য বিনা অতএব গত্যন্তর নেই ;
এবং যেকালে আজও রয়েছি বেঁচেই,
তখন কী ক'রে মরি, মৌরসের উচ্ছেদ না হোক,
অন্তত চৌধুরীদের ভদ্রাসনক্রোক
স্বচক্ষে না দেখে :
তাতে যদি দুলালেরা নম্রতা বা কাণ্ডজ্ঞান শেখে॥

বৃষ্টির বিবিক্ত দিনে ভুলি সে-সকলই ;
এ-বাড়ির অনুমিত গলি
মনে হয় অগ্রণীর পদপ্রার্থী পথ,
যার প্রান্তে মুদ্রিত জগৎ
স্ফূর্তির প্রতীক্ষা করে।
তখন থাকে না মনে—দিগন্তরে
উচ্ছিষ্ট উঞ্ছের বাটোয়ারা,
হিংসার প্রমারা,

স্থগিত মারীর বীজ শস্যশূন্য মাঠে ;
চ'ড়ে বসে নিহত বা নির্বাসিত স্বৈরীদের পাটে
প্রতিদ্বন্দ্বী সর্বেসর্বা যত ; নিরর্থক
পূষার একর্ষি নাম, অসূর্যের পুরাণ ঝলক,
হিরণ্ময় পাত্র ঠেলে ফেলে,
দেয় মেলে
অন্ধতম অতিপ্রজ বল্মীকে-বল্মীকে ;
বিমানের ব্যূহ চতুর্দিকে,
মাতরিশ্বা পরিভূ কবির কণ্ঠশ্বাস।
মূল্যহ্রাস
সর্বত্র সর্বথা
আবশ্যিক,—বোঝে না সে-সোজা কথা
শুধু যার ভূসম্পত্তি আছে ;
উদয়াস্ত ভেবে মরি,—খেয়ে-প'রে নেহাৎ যা বাঁচে
নির্ভয়ে তা খাটাতে পারি না।
অথচ প্রত্যহ শুনি চার্চিলের স্বেচ্ছাচার বিনা
অসাধ্য সাম্রাজ্যরক্ষা, অব্যর্থ প্রলয়,
এবং যে-ব্যক্তিস্বত্ব সভ্যতার সম্মত আশ্রয়,
তারও অব্যাহতি নেই অপঘাত থেকে :
একা হিটলারের নিন্দা সাধে আজ বাধে কি বিবেকে ?

কিন্তু তার দিব্য আবির্ভাবে
প্রেতার্ত অভাবে
জাগে যেন প্রজ্ঞাপারমিতার অভয় ;
ক্লেদ-মেদ-খেদের আলয়—
জঘন্য জান্তব দেহে দেশ-কাল-সংকলিত মল
সংসক্ত থাকে না আর ; তন্মাত্রাসম্বল
হয় তনু আচম্বিতে।
নির্বিকার স্বপ্নের নিভৃতে,

বিয়োগান্ত নাটকের উদ্যোগী নায়ক, আমি পাতি
যৌবরাজ্য,—ব্যোমযান, কামান, পদাতি
যে-রাষ্ট্রের অঙ্গ নয় ; ন্যায়, ক্ষমা, মিতালি, মনীষা
যার মুখ্য অবলম্ব, জিজীবিষা
সামান্য লক্ষণ ;
শ্বাপদসংকুল নয় যেখানে কানন,
দুরাক্রম্য নয় গিরিচূড়া,
পরিস্রুত সুরা।
নিদাঘের অফুরন্ত দিন,
সুবর্ণধারার শষ্পশ্যামল পুলিন
উৎপিঞ্জর তারুণ্যের লাস্যময় লীলায় মুখর,
গন্ধবহসম্মার্জিত স্বরাট্ অম্বর
দেয় ফিরে
অবরোহী সন্ধ্যার শিশিরে
অনুপূর্ব মানুষের অভ্যুদিত চিত্তের প্রসাদ ;
জয়যুক্ত স্ট্রেসেমান্-ব্রিয়াঁর সংবাদ ॥

হয়তো তখনই
উপশয়ী সংবর্তের আড়ালে অশনি
লেলিহান করবালে ধার দিতে শুরু করেছিলো।
প্রবাদের ধুয়ো ধরেছিলো
তৎপূর্বে অন্তত
মুসোলীনি যুদ্ধগামী বর্বরের মতো ;
এবং উদ্বাস্তু ট্রট্স্কি ইতিমধ্যে দেশে-দেশান্তরে
ঘুরে মরেছিলো, পুরাকালীন শহরে
গলঘণ্ট কুষ্ঠরোগী যত দ্বার সব বন্ধ দেখে
যেমন নির্জনে যেতো ভিক্ষাব্যাতিরেকে।
কিন্তু তার
বভ্রু কেশে অস্তগত সবিতার উত্তরাধিকার,

সংহৃত শরীরে
দ্রাক্ষার সিতাংশু কান্তি, নীলাঞ্জন চোখের গভীরে
তাচ্ছিল্যের দামিনীবিলাস ;
গ্যেটে, হ্যেল্‌ডার্লিন, রিল্‌কে, টমাস মানের উপন্যাস
দেওয়ালের খোপে-খোপে, বাঘের সনাটা
ক্লাভিয়েরে, শতায়ু ওকের পাটা
তেজস্ক্রিয় উৎকোণ পটলে ;
বায়ব্য অঞ্চলে
রক্ষিত মঙ্গলদীপ, অনাদি নগরী,
মালা জ'পে, কাটায় শর্বরী
স্বপ্নাবিষ্ট সভ্যতার নিশ্চিন্ত শিয়রে।
লেগেছিলো হাস্যকর স্বভাবত সে-সবের পরে
কূটাগার থেকে দেখা স্বস্তিকলাঞ্ছন
বালখিল্য নাট্‌সীদের সমস্বর নামসংকীর্তন
মশালের ধূমার্ত আলোকে :
বরঞ্চ বৃষ্টির দিনে স্তব্ধ শোকে
নির্বাক বিদায়
স্মরণীয় স্বস্থ মর্যাদায় ॥

অবশ্য বুঝেছি আজ এ-সিদ্ধান্ত নিতান্তই মেকি ;
কারণ অন্বয়ব্যতিরেকী
সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত,
এবং সে-নিত্যবিপরীত
দ্বন্দ্বসমাসের সঙ্গে তুলনীয় মেরুবিপর্যয়
বিকল্পস্বভাব ক্ষেত্রে। নিঃসংশয়
উপরন্তু এও
বিশ্বামিত্র দস্যুরাই ব্যক্তিনামধেয়
যদিচ প্রাজ্ঞের মতে, তবু ব্যষ্টিসংকল্পের ঝোঁকে
প্রাগুক্ত দোলকে

কখনও বিলম্ব ঘটে, কদাচিৎ চ্যুতি।
তবে কেন ভোলে প্রতিশ্রুতি?
বারোটা উত্তীর্ণ, কিন্তু টেলিফোন করে কই লীলা?
অথচ রঙ্গিলা
নয় সে দীপ্তির মতো; অন্তত সে জানে
সমাজের ঘুম নেই, শ্রুতি আছে দেওয়ালের কানে;
গোপন সুযোগ
নিতান্ত দুর্লভ তাই, উপভোগ
পরিণামচিন্তায় ব্যাহত।
তাহ'লে কি অসময়ে ফিরেছে প্রমথ
নিন্দুকের প্রেরণায়? এত দিনে সফল নতুবা
সে-বাচাল যুবা
যার পেশা কৃতীর সম্ভ্রমহানি?
ইচ্ছার সামর্থ্য নেই মানি;
তথাপি টাকার আজ্ঞা প্রলয়েও লঙ্ঘনীয় নয়:
বন্ধকীর নিলামে বিক্রয়
মারোয়াড়িদের গ্রাসে তুলে দেয় বাঙালির দায়।
সুতরাং যে মাঝারিবয়সীকে চায়,
সে নিশ্চয় প্রকৃতিভিখারী,
নচেৎ বিকারী॥

বৃথা স্বপ্ন; সংকল্প অক্ষম;
মতিভ্রম
বৃষ্টির বিবিক্ত দিনে অসংলগ্ন স্মৃতির সংগ্রহে
কিংবা শুধু মৌখিক বিদ্রোহে
নিঃসঙ্গ জরার আর্তি ভোলার প্রয়াস।
কিন্তু মানবেতিহাসে মাঝে-মাঝে আসে মলমাস,
কর্মচ্যুত পৃথিবী যখন
উন্মার্গ ঘুমের ঘোরে, নাক্ষত্রিক সহযাত্রীগণ

সে-অপচারীকে ভুলে ছোটে লোকাতীতে ;
নির্বাণ নিশীথে
কারারুদ্ধ আয়ুর মিয়াদ,
রোমন্থ বিস্বাদ,
বিষায়িত ভবিষ্যের ধ্যান,
অভিজ্ঞান
শকুন্তের স্পর্শকলুষিত।
প্রমাবিরহিত
অন্ধ বিশ্বাসের বশে তখন মানুষ খোঁজে ফের
অশক্ত বা অসম্পৃক্ত অধিদৈবতের
পুরাতন পদপ্রান্তে সংগতি বা পৈতৃক অমিয়,
কার্যত যদিও
ঐকান্তিক শূন্য তাকে করে বিশ্বম্ভর,
কারণ তখন বায়ু অনিলে মেশে না, অবস্কর
ভস্মান্ত হয় না, অনুব্যবসায়ী ক্রতু
বোঝে সন্তাপেও ব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের বীতাগ্নি বেপথু।
অন্তর্হিত আজ অন্তর্যামী :
রুশের রহস্যে লুপ্ত লেনিনের মামি,
হাতুড়িনিষ্পিষ্ট ট্রট্স্কি, হিটলারের সুহৃদ স্টালিন,
মৃত স্পেন, ম্রিয়মাণ চীন,
কবন্ধ ফরাসীদেশ। সে এখনও বেঁচে আছে কি না,
তা সুদ্ধ জানি না॥

৬৫. যযাতি

(অংশ)

অবশ্য আমার
পক্ষে সংগত যে নয় অনুতাপ, সে-কথা স্বীকার
করি ; কারণ যদিচ মগ্ন শৈলে আমার মাতাল
নৌকা খানচাল হ'য়ে, বর্তমানে বিশ্লিষ্ট কঙ্কাল—

অপ্রাপ্তসৎকার শব প'চে প'চে অস্থিসার যেন—
তথাপি যেকালে নিরুদ্দেশ যাত্রার সংজ্ঞায় হেন
দুরবস্থা শুধু সম্ভাব্যই নয়, অবশ্যম্ভাবীও
বটে, অশোভন তখন নির্বেদ। তাছাড়া স্বকীয়
সিদ্ধি প্রার্থনীয় নয় সূত্রধার গণেশের কাছে ;
অকূল পাথারে অযাচিত সাম্রাজ্য একদা বাচে
যারা জিতেছিলো, অন্তত তাদের অনন্য সম্বল
ছিলো প্রাণপাত পৌরুষ এবং রুদ্র কৌতূহল—
নিতান্ত নিরুপলক্ষ। তরল অনলে পরিণত
ঝলমল জল ; গলিত অম্বরতল ; অনুগত
দিগ্বধূর আঁখি ছলছল কষ্টকল্পনায় ; মেঘে
অন্তর্হিত চূড়া, পদান্ত ঊর্মির মুখর উদ্বেগে
প্রতিষ্ঠিত অস্তগিরি, ইত্যাদি বিবাদী লক্ষণের
অলৌকিক নির্বিরোধ তথা সে-সমন্বয়ের জের
স্মিত বিদেশিনীর অভয়ে, এবং সোনার তরী
তাদের ডাকেনি অজানার অভিসারে। হিংস্র অরি
বন্দরে বন্দরে, অবিশ্বাস্য অনুচর, অবহেলা
চরমে নিশ্চিত জেনেই, বেরিয়েছিলো তারা॥

ভেলা

আমি ভাসিয়েছিলুম একদা তাদেরই মতো, আজ
এটুকুই আমার পরম পরিচয়। আমাকেও
লক্ষ্যভেদী নিষাদের উল্বণ উল্লাস উদাসীন
নদীর উজানে দিয়েছিলো অব্যাহতি মাল্লাদের
গুণটানা থেকে। গাঁঠ গাঁঠ বিলাতী বস্ত্রের ভার,
রাশি রাশি আর্কিনী গমের ভাবনা ও প্রতিযোগী
ব্যাপারীর বাদ-বিসংবাদ সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিলো
চুকে ; এবং হঠাৎ অধোগতি অনুকূল স্রোতে
হয়েছিলো অবারিত। অন্তরীক্ষ বিদীর্ণ বিদ্যুতে ;

ভ্রমি ; ভঙ্গ ; জলস্তম্ভ ; সমুখ প্রত্যুষ কপোতের
পক্ষবিধূনন ; সন্নত সবিতা বেগুনী শোণিতে
লুপ্ত রহস্যের বীভৎস প্রতীক ; ফুটন্ত জলার
জালে জর্জরিত তিমি ; শেষনাগ শিথিলকুণ্ডলী,
মৎকুণের উপজীব্য ; অপ্রমেয় নির্বাতমণ্ডলে
বিধ্বস্ত সলিল ; উর্ধ্বশ্বাস বরুণের বিপরীত
রতি—সবই দেখেছিলুম আমিও, না দেখে দেখেছি
ব'লে ভাবিনি অথবা অস্বীকার করিনি দেখার
পরে ; এবং এখন স্বভাবের অনুমোদনেই
আমার অনন্য স্বপ্ন প্রাচীন প্রাকারে সুরক্ষিত
জনপদ, স্নিগ্ধ, সান্দ্র সন্ধ্যায় যেখানে খিন্ন শিশু
ভঙ্গুর তরণী-সহ মুকুরিত নিকষ গোষ্পদে ॥

কিন্তু গত শতকেও উল্লিখিত গ্রামের সন্ধান
পায়নি স্বয়ং র‍্যাঁবো, সার্বজন্য রসের নিপান
মৃগতৃষ্ণানিবারণে অসমর্থ ব'লে, সে যদিও
ছুটেছিলো জনশূন্য পূর্ব আফ্রিকায়, পরকীয়
সাম্রাজ্যবাদের প্রায়শ্চিত্তকল্পে যেন (সাকী আর
কবিতা সেখানে যেমন অভাবনীয়, মদিরার
অপর্যাপ্তি তেমনই দারুণ)। আমি বিংশ শতাব্দীর
সমানবয়সী ; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে ; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে
নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।
কারণ ভূতের নির্বন্ধাতিশয়ে, তথা ভবিষ্যের
নিষেধে, অধুনা ত্রিশঙ্কু, এবং সে-খণ্ড বিশ্বের
মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে, জানি কি না জানি,
নাস্তিরই বিবর্তবাদ। এমনকি উপস্থিত হানি

সম্ভবত অবাস্তব স্খলিত সে-পদ্যের মতো,
যাতে রেণু, বেণু, কদাচ ধেনুও, মিলে, ক্রমাগত
অভিভাবে আত্মোপলব্ধির অভাব লুকিয়ে রাখে ;
এবং অলীক ভেবে, উচ্ছ্বসিত স্বপ্নরচনাকে
যখন করেছি ত্যাগ, সেকালে স্বকপোলকল্পিত
সর্বনাশে হাহুতাশ অবৈধ ও সাফল্যবর্জিত ॥

মণীশ ঘটক (জ. ১৯০১)

৬৬. পরমা

আর কেহ বুঝিবে না ; তোমাতে আমাতে
এ-বোঝপড়ার পালা সাঙ্গ ক'রে যাবো আজ রাতে
অন্তরঙ্গ আলাপনে।
রাত্রির অঞ্চল সঞ্চালনে
শান্ততর, স্নিগ্ধতর হ'য়ে এলো বায়ু,
তৃতীয়ার চন্দ্রের প্রমায়ু
হ'লো শেষ। মেঘলোক হ'য়ে পার
ঘনিষ্ঠ আশ্লেষ রচে পরম আত্মীয় অন্ধকার।

হলা পিয় সহি,
জান্তব জিগীষা বক্ষে অতীতের সে-নিষাদ নহি আমি নহি।
একদা যে-আসঙ্গের ক্রূর আক্রমণ
সবিদ্রূপে উপেক্ষিয়া কুমারীর আত্মরক্ষা-পণ
বধির বাসব-হস্তচ্যুত বজ্রসম
তোমারে করিলো চূর্ণ, আমারি নির্মম
স্বার্থ-পরমার্থ-দ্বন্দ্বে আজি নির্বাপিত
সে-অনল, স্মৃতিভস্মস্তূপে সমাহিত।
অনলস কাল-আবর্তনে

মহীরুহ হয়েছে অঙ্গার। হয়তো পরম কোনো ক্ষণে
অঙ্গারে ফুটিবে হীরা। সে-প্রসঙ্গ আজি অবান্তর।

পূর্ণলোহ যৌবনের মধ্যাহ্নে ভাস্কর
সেদিন জ্বলিতেছিলো এ দেহ-অম্বরে।
দিকে দিগন্তরে
সমীর শ্বসিতেছিলো অগ্নিবর্ষী শ্বাস।
চক্ষে ভরি' ত্রাস,
তুমি কেন ঝাঁপ দিলে সে-ধ্বংস-উৎসবে?
যৌবনগৌরবে
বল্কলশাসনমুক্ত তুঙ্গ স্তনদ্বয়
সহসা উদ্বেল হ'লো শুভ্র বক্ষময়,
শিহরিলো প্রবাল অধর
কেন্দ্রীভূত কামনার চুম্বকবিথারে থরথর।
অজ্ঞাত শঙ্কায়
অপাঙ্গে অনঙ্গতীর মুহুর্মুহু থমকিলো, হায়!
আশ্রম-আশ্রয় ত্যজি আজন্ম তাপসী কণ্বসুতা
নিষ্কলুষা কুরঙ্গীর নৃত্যরঙ্গে হ'লে আবির্ভূতা।
নিষ্করুণ কিরাতের পরুষ সংস্পর্শে আচম্বিত
মদাপ্লুতা,—হারালে সংবিৎ।

হায় সখি হায়,
তুমি তো জানিলে নাকো সেই মৃগয়ায়
এক অস্ত্রে হত হ'লো মৃগী ও নিষাদ।
আদিরিপু উন্মোচিলো প্লাবনের বাঁধ,
সেই পথ দিয়া
প্রেম এলো বন্যাসম দু-কূল প্লাবিয়া
সুগম্ভীর সমারোহে।
অনাদ্যন্ত আজো তাহা বহে

দুর্বার প্রবাহে তুলি উন্মত্ত কল্লোল,
আমার নিখিল তারই উল্লাসে আজিও উতরোল।

অমিয় চক্রবর্তী (জ. ১৯০১)

৬৭. সংগতি

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা।
মেলাবেন।
পাগল ঝাপটে দেবে না গায়েতে কাঁটা।
আকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা
মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা,—
বন্যার জল, তবু ঝরে জল,
প্রলয়-কাঁদনে ভাসে ধরাতল—
মেলাবেন।
তোমার আমার নানা সংগ্রাম,
দেশের দশের সাধনা, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
মেলাবেন।
জীবন, জীবন-মোহ,
ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ—
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।
দুপুর ছায়ায় ঢাকা,
সঙ্গীহারানো পাখি উড়ায়েছে পাখা,
পাখায় কেন যে নানা রং তার আঁকা।
প্রাণ নেই, তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা
—মেলাবেন।

তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন।
মোটর গাড়ির চাকায় ওড়ায় ধুলো,
যারা স'রে যায় তারা শুধু—লোকগুলো ;
কঠিন, কাতর, উদ্ধত, অসহায়,
যারা পায়, যারা সবই থেকে নাহি পায়,
কেন কিছু আছে বোঝানো, বোঝা না যায়—
মেলাবেন।
দেবতা তবুও ধরেছে মলিন ঝাঁটা,
স্পর্শ বাঁচায়ে পুণ্যের পথে হাঁটা,
সমাজধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা,
ঝোড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটা
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন॥

৬৮. বৃষ্টি

অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে॥
বৃষ্টি ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিগন্তপিয়াসী মাঠে, স্তব্ধ মাঠে,
মরুময় দীর্ঘ তিয়াষার মাঠে, ঝরে বনতলে,
ঘনশ্যামরোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে
শিরায়-শিরায় স্নানে, বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।
ধানের খেতের কাঁচা মাটি, গ্রামের বুকের কাঁচা বাটে,
বৃষ্টি পড়ে মধ্যদিনে অবিরল বর্ষাধারাজলে॥

যাই ভিজে ঘাসে-ঘাসে বাগানের নিবিড় পল্লবে
স্তম্ভিত দিঘির জলে, স্তরে-স্তরে, আকাশে মাটিতে॥

অন্ধকার বর্ষাদিনে বৃষ্টি ঝরে জলের নির্ঝরে
গতির অসংখ্য বেগে, অবিশ্রান্ত জাগ্রত সঞ্চারে, স্বপ্নবেগে

সঙ্কলিত মেঘে, মাঠে, কম্পিত মাটির অনুপ্রাণে।
গেরুয়া পাথরে জল পড়ে, অরণ্য তরঙ্গশীর্ষে, মাঠে
ফিরে নামে মর্মজল সমুদ্রে মাটিতে।
বৃষ্টি ঝরে॥

মেঘে মাঠে শুভক্ষণে ঐক্যধারে
বিদ্যুতে
আগুনে
ঘূর্ণাঝড়ে
সৃজনের অন্ধকারে বৃষ্টি নামে বর্ষাজলধারে॥

রচিত বৃষ্টির পারে, রৌদ্র মাটি, রুদ্র দিন, দূর,
উদাসীন মাঠে-মাঠে আকাশেতে লগ্নহীন সুর॥

৬৯. বড়োবাবুর কাছে নিবেদন

তালিকা প্রস্তুত
কী কী কেড়ে নিতে পারবে না—
হই না নির্বাসিত কেরানি।
বাস্তুভিটে পৃথিবীটার সাধারণ অস্তিত্ব।
যার এক খণ্ড এই ক্ষুদ্র চাকরের আমিত্ব।
যতদিন বাঁচি, ভোরের আকাশে চোখ জাগানো,
হাওয়া উঠলে হাওয়া মুখে লাগানো।
কুয়োর ঠাণ্ডা জল, গানের কান, বইয়ের দৃষ্টি
গ্রীষ্মের দুপুরে বৃষ্টি।
আপন জনকে ভালোবাসা,
বাংলার স্মৃতিদীর্ণ বাড়ি-ফেরার আশা।

তাড়াও সংসার, রাখলাম,
বুকে ঢাকলাম

জন্ম-জন্মান্তরের তৃপ্তি যার যোগ প্রাচীন গাছের ছায়ায়
তুলসী-মণ্ডপে, নদীর পোড়ো দেউলে, আপন ভাষার কণ্ঠের মায়ায়।
থর্ডক্লাশের ট্রেনে যেতে জানলায় চাওয়া,
ধানের মাড়াই, কলা গাছ, কুকুর, খিড়কি-পথ ঘাসে ছাওয়া।
মেঘ করেছে, দু-পাশে ডোবা, সবুজ পানার ডোবা,
সুন্দরফুল কচুরিপানার শঙ্কিত শোভা,
গঙ্গার ভরা জল ; ছোটো নদী ; গাঁয়ের নিমছায়াতীর—
হায়, এও তো ফেরা-ট্রেনের কথা।

শত শতাব্দীর
তরু বনশ্রী
নির্জন মনশ্রী :
তোমায় শোনাই, উপস্থিত ফর্দে আরো আছে—
দূর-সংসারে এলো কাছে
বাঁচবার সার্থকতা॥

৭০. চেতন স্যাকরা

সোনা বানাই। সাঁকোর বাঁ পাশে গয়না
কাচের বাক্সে, জানালায় দ্রষ্টব্য ; জানলার উপর ময়না
রেগে ওঠে তোমাদের ভিড়ে—ছোলা খাও, বলো "রাধে
রাধে" "কেষ্ট কেষ্ট"—বলতে বাধে

গলিতে, তোমাদের অতীব নোংরা গলিতে,
সোনার সুন্দর, রুপোর রূপকার, এই নর্দমার দোকান দেহলিতে
ধ্যান বানাই। এই আমার উত্তর।
ড্রেন, ধুলো, মাছি, মশা, ঘেয়ো কুত্তোর

আড়ৎ বেঁধে আছো, বাঁচো (কিমাশ্চর্য বাঁচা) এবং যমের কৃপায়, মরা ;
অমৃতস্য অধম পুত্র, বন্দী স্যাঁৎসেঁতে গলির ঘরে ইঁদুর-ভরা ;

নেই রাগ।—অবশ্য। আছো আনন্দে। খাও ভেজাল ঘিয়ের জিলিপি,
শিশু কাঁদায়, ধোঁয়ার সংসার, খুলে ওষুধের ছিপি

মা-বোনকে খাওয়াও—দয়ার ডাক্তার অন্তিম লাগলে,
তৎপূর্বাবধি রান্নার পাকে ক'ষে ঘোরাও ; নিজে ভাগলে,
শক্ত সিনেমার সীটে, ইতর প্রাণের গিলটি
মুখ-ভরা পান, দৃশ্য হলিউড, মোক্ষের পিল্‌টি

ভোলায় ধিক্কার, সন্ধেটা কাটে , তবু রাত্রে জেগে ভাবো, ভাবোই
কিছু একটা হয়তো হবে, বুঝি বা কোথায় যাবো, যাবোই—
কোথাও যাবে না, গলিতেই থাকবে। বড়ো রাস্তায় যাদের বাসা
হাঁ ক'রে দেখবে তাদের মোটর, পনেরোটা বেড়াল, সখের চাকর—
থাকবে খাসা,

কেউ ছোঁবে না তাদের ঘোড়দৌড়, মদ-পাশা ; দারোয়ানের লাঠি
বাঁচাবে তাদের লুঠ-ভরা সিন্দুক ; একটু ঈর্ষা করবে, দীর্ঘশ্বাস,
তবু তাদের চাটবে মাটি,
চাকরির রাস্তায়। তোমরা ধার্মিক, কৃষ্ণের জীব, বিদ্রোহ করো না,
অদৃষ্ট মানো,
পরজন্মের পথ পাও গলিতেই : আহা গদ্‌গদ্‌ মাদুলি,
তাগা, মূর্তি, বুকে টানো ;

গুরুর দর্শন, কর্তার বাক্য, দলীয় ভক্তির অদ্ভুত দৈবে
মরলে যাও স্বর্গে—জীবনকে বানাও নরক—বিশুদ্ধ আর্যামি সইবে
বিদেশীর শাসন ; যতক্ষণ আছে জাত, অধিকারী-তত্ত্ব, ম্লেচ্ছকে ঘৃণা,
ভয় কী দেশের ? বাহিরের পরাজয় হবেই তো, (ভিতরে জীবন্মুক্ত)
কলিযুগ কিনা।

তাল-তাল সোনা, উত্তম উত্তর ; ছুঁড়ে তো মারা যায় না ?
গলিয়ে গলিতে মেশাই রোদ্দুরে, দাঁড়ের ময়নাকে দিই বায়না

গান শোনায় বনের ; চোখে আছে, আমার চালশের চোখেও, গাঁয়ে
গঙ্গার উপর
শুভ্র ধাপ, তেঁতুলগাছের ঝিলমিল, প্রাণের ছাঁদ মেলাই রুপোর

চন্দ্রহারে, দোলাই কানের দুলে, আমার উত্তর মণিতে বাঁধি ;
জেলে দিতে পারিনে গলিকে (এবং তোমাদের), নই নৈতিক পল্টন,
সভার বক্তা ইত্যাদি ।
শুধু জানি আগুন, আগুনের কাজ, সৃষ্টির আগুন, লাগলে প্রাণে
তীব্র হানে বেদনা জাগবার, আর্টের আগুন, মরীয়াকে টানে ।

গর্বিত আধবুড়োর উদ্ধত এই গয়না ।
ভিড়ে কাচ ভেঙো না ;—বুলি, বুলি, রাম রাম, বলো ময়না
বলো ফার্সি, আরবি, ধার্মিক গজল—ফিরে গলির গর্তে
সোনার মার নাও সঙ্গে—পারো তো কিছু কিনো—থাক, চাইনে
খদ্দের ধরতে ॥

৭১. পিঁপড়ে

আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ঘুরুক দেখুক থাকুক
কেমন যেন চেনা লাগে ব্যস্ত মধুর চলা—
স্তব্ধ শুধু চলায় কথা বলা—
আলোয় গন্ধে ছুঁয়ে তার ঐ ভুবন ভ'রে রাখুক,
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ধুলোর রেণু মাখুক ॥

ভয় করে তাই আজ সরিয়ে দিতে
কাউকে, ওকে চাইনে দুঃখ নিতে ।
কে জানে প্রাণ আনলো কেন ওর পরিচয় কিছু,
গাছের তলায় হাওয়ার ভোরে কোথায় চলে নিচু—
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে সেই অতলে ডাকুক ।
মাটির বুকে যারাই আছি এই দু-দিনের ঘরে
তার স্মরণে সবাইকে আজ ঘিরেছে আদরে ॥

৭২. রাত্রিযাপন

বুকে প্রাণটা এমনিই রইলো, জানো ভাই,
ঘরে দাঁড়িয়ে মন বললে শুধু, যাই
—যাই।
প্রকাণ্ড তামার চাঁদ রাত্রে
গ'লে হ'লো সোনা। সোনার পাত্রে
পরে আভার ছড়ালো অন্তর্লীন রোদ্দুর।
নৌকো দূরে গেলো বেয়ে সেই নীল অভ্রের সমুদ্দুর।
সেদিন রাত্রে যখন আমার কুমু বোনকে হারাই।

আর, অজ্ঞান মুহূর্তগুলো, তারায়
মিলিয়ে রইলো স্বচ্ছধারায়।
জেগে-থাকা চোখে,
মাটিগাছমাঠের জমা-ঠাণ্ডা দৃশ্য পলকে-পলকে
বদলালো একটু বর্ণ; তবু বর্ণহীন
একটু আলো ছিলো, ক্ষীণ, খুব ক্ষীণ।
আলোর সূক্ষ্ম প্রাণ অণুতে-অণুতে কী হচ্ছিলো। কালোর মধ্যে
দিয়ে উদয়।
অন্য কিছু নয়।

তিরোহিত চন্দ্রবর্ণ আকাশে উষা
এলো আবার দিন, প্রাচীন সোনার বেশভূষা।
ঘরের দেয়ালগুলো ফুটলো রাঙা আঁচড়ে।
তারপর? মেঘের স্তরে-স্তরে
রোজকার বিষণ্ণ সুন্দর সকাল এলো ভ'রে।

তখন দরজায় দেখলেম দাঁড়িয়ে—হঠাৎ—আছি সবাই,
জানো ভাই,
—আর সবাই।

বুকের হাড়ে শক্ত কান্না নেই, কেবল, কী জানি
হয়তো এমনিই মনে-করা,
যাই, একবার যাই। রইলাম তবু। শক্ত ধরা॥

৭৩. বৃষ্টি

কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

ফাল্গুন বিকেলে বৃষ্টি নামে।
শহরের পথে দ্রুত অন্ধকার।
লুটোয় পাথরে জল, হাওয়া তমস্বিনী :
আকাশে বিদ্যুৎজ্বলা বর্শা হানে
ইন্দ্রমেঘ ;
কালো দিন গলির রাস্তায়।
কেঁদেও পাবে না তাকে অজস্র বর্ষার জলধারে।

নিবিষ্ট ক্রান্তির স্বর ঝরঝর বুকে
অবারিত।
চকিত গলির প্রান্তে লাল আভা দুরন্ত সিঁদুরে
পরায় মুহূর্ত-টিপ,
নিভে যায় চোখে
কম্পিত নগরশীর্ষে বাড়ির জটিল বোবা রেখা।
বিরামস্তম্ভিত লগ্ন ভেঙে
আবার ঘনায় জল।
বলে নাম, বলে নাম, অবিশ্রাম ঘুরে-ঘুরে হাওয়া
খুঁজেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

আদিম বর্ষণ জল, হাওয়া, পৃথিবীর।
মত্ত দিন, মুগ্ধ ক্ষণ, প্রথম ঝংকার
অবিরহ,

সেই সৃষ্টিক্ষণ
স্রোতঃস্বনা
মৃত্তিকার সত্তা স্মৃতিহীনা
প্রশস্ত প্রাচীন নামে নিবিড় সন্ধ্যায়,
এক আর্দ্র চৈতন্যের স্তব্ধ তটে।
ভেসে মুছে ধুয়ে ঢাকা সৃষ্টির আকাশে দৃষ্টিলোক।
কী বিহ্বল মাটি, গাছ, দাঁড়ানো মানুষ দরজায়
গুহার আঁধারে চিত্র, ঝড়ে উতরোল
বারে-বারে পাওয়া, হাওয়া, হারানো নিরন্ত ফিরে-ফিরে—
ঘনমেঘলীন
কেঁদেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে॥

৭৪. সাবেকি

গেলো
গুরুচরণ কামার, দোকানটা তার মামার,
হাতুড়ি আর হাপর ধারের (জানা ছিলো আমার)
দেহটা নিজস্ব।

রাম নাম সত্ হ্যায়

গৌর বসাকের প'ড়ে রইলো ভরন্ত খেত খামার।

রাম নাম সত্ হ্যায়॥

দু-চার পিপে জমিয়ে নস্য   হঠাৎ ভোরে হ'লো অদৃশ্য—
ধরনটা তার খ্যাপারই—
হরেকৃষ্ণ ব্যাপারি।

রাম নাম সত্ হ্যায়

ছাই মেখে চোখ শূন্যে থুয়ে,   পেরেকের খাট তাতে শুয়ে
পলাতক সেই বিধুর স্বামী
আরো অপার্থিবের গামী

রাম নাম সত্ হ্যায়

রান্না রেঁধে কান্না কেঁদে, সকলের প্রাণে প্রাণে বেঁধে
দিদি ঠাকরুন গেলেন চ'লে—
খিড়কি দুয়োর শূন্যে খোলে।

রাম নাম সত্ হ্যায়

আমরা কাজে রই নিযুক্ত, কেউ কেরানি কেউ অভুক্ত,
লাঙল চালাই, কলম ঠেলি, যখন-তখন শুনে ফেলি

রাম নাম সত্ হ্যায়

শুনবো না আর যখন কানে বাজবে তবু এই এখানে

রাম নাম সত্ হ্যায়॥

৭৫. চিরদিন

আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোনো
জীবনে-জীবনে তার শেষ নেই কোনো।
দিনের কাহিনী কত, রাত চন্দ্রাবলী
মেঘ হয়, আলো হয়, কথা যাই বলি'।
ঘাস ফোটে, ধান ওঠে, তারা জ্বলে রাতে,
গ্রাম থেকে পাড়ি ভাঙে নদীর আঘাতে।
দুঃখেতে আবর্তে নৌকা ডোবে, ঝড় নামে,
নূতন প্রাণের বার্তা জাগে গ্রামে-গ্রামে—
নীলাম্ভ আকাশে শেষ পাইনি কখনো
আমি যেন বলি, আর, তুমি যেন শোনো।

তুমি যেন বলো, আর আমি যেন শুনি
প্রহরে-প্রহরে যায় কল্পজাল বুনি'।
কুমুদকহ্লার ভাসে থৈ-থৈ জলে
কোথা মাঠ ফেটে যায় মারীর অনলে।
আঙিনায় শিশু খেলে, ফুলে ধরে মউ,
তুলসীতলায় দীপ জ্বালে মেজো বউ।

সানাই-বাজানো রাতে হঠাৎ জনতা
বিয়ে ভেঙে মালা ছিঁড়ে ছড়ায় মত্ততা।
মানুষের প্রাণে তবু অনন্ত ফাল্গুনী—
তুমি যেন বলো আর আমি যেন শুনি॥

৭৬. বিনিময়

তার বদলে পেলে—
সমস্ত ঐ স্তব্ধ পুকুর
নীল-বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর
আলোয় ভরা জল—
ফুলে নোয়ানো ছায়া-ডালটা
বেগনি মেঘের ওড়া পালটা
ভরলো হৃদয়তল—
একলা বুকে সবই মেলে॥

তার বদলে পেলে—
শাদা ভাবনা কিছুই-না-এর
খোলা রাস্তা ধুলো-পায়ের
কান্না-হারা হাওয়া—
চেনাকণ্ঠে ডাকলো দূরে
সব-হারানো এই দুপুরে
ফিরে কেউ-না-চাওয়া।
এও কি রেখে গেলে॥

৭৭. বৈদান্তিক

প্রকাণ্ড বন প্রকাণ্ড গাছ,—
বেরিয়ে এলেই নেই।
ভিতরে কত লক্ষ কথা, পাতা পাতায়, শাখা শাখায়
সবুজ অন্ধকার;

জোনাকি কীট, পাখি পালক, পেঁচার চোখ, বটের ঝুরি,
ভিতরে কত আরো গভীরে জন্তু চলে, হলদে পথ,
তীব্র ঝরে জ্যোৎস্না-হিম বুক-চিরিয়ে,
কী প্রকাণ্ড মেঘের ঝড় বৃষ্টি সেই আরণ্যক—
বেরিয়ে এলেই নেই।
ভিতরে কত মিষ্টি ফল, তীক্ষ্ণ স্বাদ ফুলের তীর,
ইচ্ছে ভরা বুনো আঙুর, জামের শাঁস,
ভিতরে কত ক্রূতের ভয়, কখনো বেলা সময়হীন—
বেরিয়ে এলেই নেই।
চক্রবাল চোখে রেখেই বাহিরে চাই,
গাঁয়ের ধোঁয়া একটু রেখা সন্ধ্যা হ'লে,
অনাসক্ত নদীর জলে সিক্ত মাটি
বিনা চাষের বুনো ধানের গুচ্ছে রয়,
এখানে সবই বিরলতার।
বুকের মধ্যে বাড়ি যাবার
খুঁজে পাবার এখনো কোনো চিহ্ন নেই ;
দৃষ্টি আছে ॥

৭৮. ১৬০৪ য়ুনিভার্সিটি ড্রাইভ

পরে-পরে নয়, একসঙ্গে। ঝিরিঝিরি
চুলে ছোঁয় বন্য হাওয়া, কানে ঝাউগাছ শিরিশিরি,
কফির সুরভি, টোস্টে মাখনের স্বাদ মধু-মেশা,
ভোর সাড়ে-সাতটার গোলাপি আলোর ঠাণ্ডা নেশা—
মুহূর্তের এই মূর্তিবহ
শরীরী চৈতন্যে বাঁধা আমার সংগ্রহ
ও-ডি-কলোনের গন্ধমাখা,
বন্ধু, তোমায় আজ নীলান্তে পাঠাই দূর পাখা।

ঝগ্ ঝগ্ ট্রেন শব্দ, স্টেশনের স্তব্ধ রোদ,
কাল রাত্রে স্বপ্নে-দেখা ডোবা বোধ,
পৌঁছনো তবুও ফিরে-চাওয়া ;
ক্লাশে পড়ানোর ঘণ্টা ঐ বাজে, ব্যস্ত হাওয়া।
লরেন্সে আমার বাড়ি, সোনার গমের কিনারায়
বিদায়-সিঁড়িতে তার এ-লগ্ন দাঁড়ায়—
(ঠিকানা এখনো সেই : ষোলো-শূন্য-চার)
কলোনের স্মৃতি-গাঁথা নাও উপহার ॥

৭৯. ওক্লাহোমা

সাক্ষাৎ সন্ধান এই পেয়েছো কি ৩-টে ২৫-শে ?
বিকেলের উইলো বনে রেড্ অ্যারো ট্রেনের হুইসিল
শব্দশেষ ছুঁচে গাঁথে দূর শূন্যে দ্রুত ধোঁয়া নীল ;
মার্কিন ডাঙার বুকে ঝোড়ো অবসান গেলো মিশে ॥
অবসান গেলো মিশে ॥

মাথা নাড়ে "জানি" "জানি" ক্যাথলিক গির্জাচুড়া স্থির,
পুরোনো রোদ্দুরে ওড়া কাকের কাকলি পাখা ভিড় ;
অন্যমনস্ক মস্ত শহরে হঠাৎ কুয়াশায়
ইস্পাতি রেলের ধারে হুহু শীত-হাওয়া ট'লে যায় ॥
শীত-হাওয়া ট'লে যায় ॥

হৃৎপিণ্ডে রক্তের ধ্বনি যেখানে মনের শিরা ছিঁড়ে
যাত্রী চ'লে গেলো পথে কোটি ওক্লাহোমা পারে লীন,
রক্ত ক্রুশে বিদ্ধ ক্ষণে গির্জে জ্বলে রাঙা সে-তিমিরে—
বিচ্ছেদের কল্পান্তরে প্রশ্ন ফিরে আসে চিরদিন ॥
ফিরে আসে চিরদিন।

৮০. এপারে

দেখলাম দু-চক্ষু ভ'রে, হে প্রভু ঈশ্বরমহাশয়
চৈতন্যে প্রসন্ন সূর্য,
খচিত রাত্রির দেয়া গান
রেডিয়ো নক্ষত্রে বাজলো এই দেহে ঝিমঝিম দূরে
শিরায় জড়ানো নহবৎ।
ইন্দ্রিয়ের চূর্ণ স্বরে
জেগেছে সংসারপ্রান্তে আদিম গায়ত্রীমন্ত্রময়
ভূর্ভুবঃ স্বঃ।
হোক না স্বেচ্ছায় বন্দী প্রাণ
হঠাৎ মুক্তি সে পেলো।
(কিছু বন্দীদশা ইচ্ছাতীত,
সে-তর্কে নামবো না আজ।)
মহাশয়, পার্থিবের দেশে
স্বীকার্য, অনেক হ'লো : সভ্যতা যতই পাপ কাজে
যুদ্ধে হানে জ্যোতির্বুদ্ধি, রক্তবহা যন্ত্রণা সমাজে
গঙ্গোত্রীর ধারা নেমে বার-বার অলক্ষ্য রঙ্গিত
ধুয়ে মুছে দিয়ে গেলো মুহূর্তে অক্ষয় লোকালয়
কোটি মৃত্যু কান্না-ছোঁয়া সমুদ্রের নীল নিরুদ্দেশে।
শুধু আজ্ঞা দাও, যেন বুঝি
আয়ুকাব্য মহাময়
অধ্যায়ে-অধ্যায়ে খোলা অভাব্যের এই পরিচয়
গ্রন্থিবাঁধা তারি মধ্যে এসে আমি জন্মমৃত্যুপারে
আজো কোন খুঁজি বাসা,
এদিকে পঞ্চাশ হ'লো, দিন
এ-যাত্রা সন্ধ্যায় ক্রমে সন্ধিক্ষণে হ'য়ে আসে ক্ষীণ
পালা-বদলের বেলা,
মেলাবে কি যোগ অন্ধকারে
সৌরধুলো-তৈরি দেহ রাখি যবে, ঘরে-ফেরা বাঁশি—
বহু পথ এসেছি তো বস্টনে বাঙালি দূরবাসী॥

৮১. রাত্রি

অতন্দ্রিলা,
ঘুমোওনি জানি
তাই চুপিচুপি গাঢ় রাত্রে শুয়ে
বলি, শোনো,
সৌরতারা-ছাওয়া এই বিছানায়
—সূক্ষ্মজাল রাত্রির মশারি—
কত দীর্ঘ দু-জনার গেলো সারাদিন,
আলাদা নিশ্বাসে—
এতক্ষণে ছায়া-ছায়া পাশে ছুঁই
কী আশ্চর্য দু-জনে দু-জনা—
অতন্দ্রিলা,
হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানায় পড়ে জ্যোৎস্না,
দেখি তুমি নেই ॥

৮২. ইতিহাস

নেবুরঙা শার্টপরা একটি মানুষ এসেছিলো
ঢালু মাটি মস্ত গাছ পেরিয়ে, নদীর ধার দিয়ে
ঘোড়া চ'ড়ে ;
কী মনে লাগলো তার, ফিরে গিয়ে
নির্জন চড়াইয়ে এলো আরো দু-জনার সঙ্গে, ব'সে
গাছতলে খানিকক্ষণ তিনজন (স্ত্রী আর গাঁয়ের খুড়ো হবে)
থলি খুলে রুটি সব্‌জি খেলো, ঘোড়া দাঁড়ালো গা ঘ'ষে
তারপরে গলা তুলে ডেকে উঠলো চিঁহি-চিঁহি রবে।
ঠুকঠাক দিনে-দিনে কাঠ কাটা, বাড়ি তোলা, ভালোবেসেছিলো

ওরা এই জায়গা। আজ সেখানে একটি খুদে পাড়া
ড্রাগ-স্টোর, বিয়র্‌-হল্‌ ; মস্ত গাছ আজও খাড়া ,

খুড়োর হদিশ নেই, শাদা অক্ষরে লেখা সিমেট্রিতে
একটা পাথরে জল-মোছা কার নাম, সেই স্ত্রীর,—
তারই সঙ্গে পুরুষের, বাইশ বছর পরে মারা যায় ;
এক ছেলে নেভাডায়, অন্য ক্যারিবিয়ানের তীর
কোন-এক দ্বীপের শহরে থাকে। খটখট শব্দ ওটা কাঠবেড়ালির।

২

পোল্ (ইতালিয়ানের সংখ্যা পাঁচ) ভাঙা ইংরেজিতে
তর্ক করে একত্র তিনজনে, ওরাই এখানে বেশি সংখ্যায় ;
উক্রেনের দুর্বৎসরে যুদ্ধের আগেই সিধে বল্টিমোরে
তারপরে ঘুরে-ঘুরে এলো সাতজন। চিনি-দানি থেকে
দু-চামচে চিনি নিয়ে কফি খায় রোগা যুবা, রেস্তরাঁয়
দেয়াল-কাগজ হলদে, পেরেকের বহু দাগ, ডেকে
ওঠে সিমেণ্ট (না সোডিয়াম) কারখানা সাইরেন জোরে
কাঁপিয়ে উপত্যকা—গ্রামের প্রধান নির্ভর ঐ ফ্যাক্টরি ; ঘোরে
ঠাণ্ডা দুপুরে চিল,

খড় উঠে ঠেকে রকে, উঁচু জুতো প'রে
মেরুন-রঙের জামা ঐ যে মেয়েটি যায়, মুখে সুখ নেই,
কী করবে, জর্জিয়া থেকে বোন সে লিখেছে চ'লে যাবে
স্বামী-ছেলে ঘরে ফেলে—স্বামী একটু বেশি মদ খায়—পাবে
হলিউডে কোনো চাকরি তা-ই মনে ক'রে ; ভাবে যেই
এর চোখে জল আসে।

দুটো মস্ত কুকুরের ঘেউঘেউ-ডাকা গেটে
জেল-এর মতন বাড়ি, থাকে কারখানা-প্রভু স্মিথ, স্টেটে
ডলারকুবের শ্রেষ্ঠ, কারখানা নানাখানে, কথা বলতে অন্য দৃষ্টি
চোখে ঘোরে,
টাক-মাথা, আপিশের যম, গ্রামের কিছুতে নেই, শিকাগোতে গাড়ি
নিজেই হাঁকিয়ে যায়, কিছুদিন থেকে ঘন-ঘন ট্রাকে ভ'রে
কী-সব জিনিস সব পাঠায় কোথায়। সন্ধ্যার ধুলোয় তাড়াতাড়ি

আজ বেলা নামলো রাঙা ব্যাপ্ত লাল,

"আনা,

ঘড়িতে দিয়েছো দম ?" ঘড়িটা আসলে মৃত, ভুলেছে সময়, নানা
ধুকধুক পেরিয়ে আজকে, মধ্যে-মধ্যে তবু চলে। খাটে শুয়ে
আনার দিদিমা
বারো বছর ঐ গির্জের পাশের ঘরে, আনার বয়স দশ, নেই সীমা
উৎসাহ খুশির তার, মোটা নীল ফিতে চুলে বাঁধা, লাল গাল,
বাপের দোকানে সারাদিন কাজ করে, ভাই তার প্রত্যহ সকাল
সাতটায় সাইকেল চ'ড়ে চ'লে যায়, পাঁচ মাইল দূরে বালি-পথে
ফিলিং স্টেশনে, খবর এনেছে কাল নতুন প্রকাণ্ড বাঁধ হবে
এই দিকে, সিসি-আইসিস দুটো নদী বেঁধে। দূরে কোন
জায়গায় তবে
ইট-বাঁধা বহু গ্রাম একত্র শহরে গেঁথে, কোনোমতে
থাকবে বহুলোক। এই গ্রাম
তাহ'লে
উঠে যাবে॥

জসীম উদ্‌দীন (তারিখ জানাননি)

৮৩. রাখালী

(অংশ)

এই গাঁয়েতে একটি মেয়ে চুলগুলি তার কালো-কালো,
মাঝে সোনার মুখটি হাসে আঁধারেতে চাঁদের আলো।
রান্‌তে ব'সে, জল আনিতে, সকল কাজেই হাসি যে তার,
এই নিয়ে সে অনেক বারই মায়ের কাছে খেয়েছে মার।
সান্‌ করিয়া ভিজে চুলে কাঁখে ভরা ঘড়ার ভারে,
মুখের হাসি দ্বিগুণ ছোটে কোনো মতেই থামতে নারে।
এই মেয়েটি এমনি ছিলো যাহার সাথেই হ'তো দেখা
তাহার মুখেই এক নিমেষে ছড়িয়ে যেতো হাসির রেখা।

মা বলিতো, বড়ু রে তুই মিছিমিছি হাসিস বড়ো,
এ শুনেও সারা গা তার হাসির চোটে নড়োনড়ো !
মুখখানি তার কাঁচা-কাঁচা, না সে সোনার, না সে আবির,
না সে করুণ সাঁঝের গাঙে আধো আলো রঙিন রবির।
কেমন যেন গাল দু'খানি মাঝে রাঙা ঠোঁটটি তাহার,
মাঠে-ফোটা কলমি ফুলে কতটা তার খেলে বাহার।
গালটি তাহার এমন পাতল ফুঁয়েই যেন যাবে উড়ে,
দু-একটি চুল এলিয়ে প'ড়ে মাথার সাথে রাখছে ধ'রে।
সাঁঝ-সকালে এ-ঘর ও-ঘর ফিরতো যখন হেসে-খেলে,
মনে হ'তো ঢেউয়ের জলে ফুলটিরে কে গেছে ফেলে !

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে ও-পথ দিয়ে চলতে ধীরে
ওই মেয়েটির রূপের গাঙে হারিয়ে গেলো কলসিটিরে।
দোষ কী তাহার ? ওই মেয়েটি মিছিমিছি এমনি হাসে,
গাঁয়ের রাখাল !—অমন রূপে কেমনে রাখে পরানটা সে ?
এ-পথ দিয়ে চলতে তাহার কোঁচার হুড়ুম যায় যে প'ড়ে,
ওই মেয়েটি কাছে এলে আঁচলে তার দেয় সে ভ'রে।
মাঠের ছেলের নাস্তা নিতে হুঁকোর আগুন নিবে যে যায়
পথ ভুলে কি যায় সে ওগো, ওই মেয়েটি রানছে যেথায় ?
নীড়ের খেতে বারে-বারে তেষ্টাতে প্রাণ যায় যে ছাড়ি',
ভর-দুপুরে আসে কেবল জল খেতে তাই ওদের বাড়ি।
ফেরার পথে ভুলেই সে যে আমের আঁটির বাঁশিটিরে
ওদের ঘরের দাওয়ায় ফেলে মাঠের পানে যায় গো ফিরে।
ওই মেয়েটি বাজিয়ে তারে ফুটিয়ে তোলে গানের ব্যথা,
রাঙা মুখের চুমোয়-চুমোয় বাজে সেথায় কিসের কথা !
এমনি ক'রে দিনে-দিনে লোকলোচনের আড়াল দিয়া
গেঁয়ো স্নেহের নানান ছলে পড়লো বাঁধা দুইটি হিয়া।

সাঁঝের বেলা ওই মেয়েটি চলতো যখন গাঙের ঘাটে,
ওই ছেলেটির ঘাসের বোঝা লাগতো ভারি ওদের বাটে।

মাথার বোঝা নামিয়ে ফেলে গামছা দিয়ে লইতো বাতাস
ওই মেয়েটির জল ভরনে ভাসতো ঢেউয়ে রূপের উছাস।
চেয়ে-চেয়ে তাদের পানে বলতো যেন মনে-মনে
"জল ভর লো সোনার মেয়ে হবে আমার বিয়ের কনে ?
কলমি ফুলের নোলক দেবো, হিজল ফুলের দেবো মালা,
মেঠো বাঁশি বাজিয়ে তোমায় ঘুম পাড়াবো, গাঁয়ের বালা।
বাঁশের কচি পাতা দিয়ে গড়িয়ে দেবো নথটি নাকের
সোনালতায় গড়বো বালা তোমার দুখান সোনা হাতের।
ওই না গাঁয়ের একটি পাশে ছোট্ট বেঁধে কুটিরখানি
মেঝেয় তাহার ছড়িয়ে দেবো সরষে ফুলের পাপড়ি আনি।
কাজলতলার হাটে গিয়ে আনবো কিনে পাটের শাড়ি,
ওগো বালা, গাঁয়ের বালা, যাবে তুমি আমার বাড়ি ?"

প্রমথনাথ বিশী (জ. ১৯০২)

৮৪. নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার তারা

নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার তারা,
দ্বিতীয়ার চাঁদ,
নীলাভ পদ্মার ধারা, শূন্যতা অগাধ।
স্তিমিত হাঁসের দল,
পশ্চিম বনান্ততল
ম্লান কাঁদো-কাঁদো ; শূন্যতা অগাধ ॥

শুধু দুটি মুগ্ধ প্রাণী,
শূন্য শরবন,
পদ্মার নাহিকো বাণী, স্বপন নির্জন।
অসীম রাত্রির পানে
যায় তারা কোনখানে
ছায়ার মতন! স্বপন নির্জন ॥

৮৫. হে পদ্মা

হে পদ্মা, তোমার
বনরেখা-বিবর্জিত দিগন্তের দেশে
ডুবে যায় ক্লান্ত রবি গলিয়া নিঃশেষে
বিন্দুমাত্র সার।

নিশ্চপল জলতল যেন একটানা
ধূমল পাটল এক বাদুড়ের ডানা
করিছে বিস্তার।
পশ্চিমে ত্রিবলী বর্ণ; কানন নিবিড়;
মুহুর্মুহু স্বচ্ছ ছায়া হতেছে গভীর;
নৃত্যশীল ভঙ্গী যেন লঘু ওড়নাটির
বিদ্যুৎপর্ণার।
হে পদ্মা, তোমার!

নদীতে শেহলা শ্যাম; রোদে পোড়া ঘাস,
দগ্ধ মাঠে উঠিতেছে উদ্ভিজ্জ সুবাস
শিশিরের স্পর্শ লভি'; বিমূঢ় বাতাস
গন্ধে আপনার।
হে পদ্মা, তোমার!

ধূমাঙ্কিত পল্লীপথে ঘণ্টা গোধূলির।
তালে-তালে দাঁড় ফেলা ক্বচিৎ তরীর।
হঠাৎ শ্রবণে পশে কুলায়-অধীর
ধ্বনি বলাকার!
বালুস্তূপে মগ্ন দীর্ঘ মাস্তুলের শিরে
দেখিনু জ্বলিছে দীপ্তি আসন্ন তিমিরে
সন্ধ্যা-তারকার,
হে পদ্মা, তোমার!

৮৬. প্রাচীন আসামী হইতে

পশ্চিম দিগন্ত আমি, জ্বলন্ত রবির
বাসনার চিতাশয্যা; তুমি সখী দূর
পূর্ববনান্তের রেখা—অতল গভীর
রহস্যের অধিনেত্রী! মোরে দগ্ধ করি'
জ্বালাই বহ্নির শিখা—তারি দৃপ্ত রাগে
হেরিতেছি কান্তি তব মূর্ছায় বিধুর।
মিলিয়াছে তব অঙ্গে দিবসশর্বরী,
দেখা না-দেখার প্রান্তে তব মূর্তি জাগে।
কোথা তুমি, কোথা আমি, শূন্যতা অগাধ,
বুকে-বুকে পরশন ঘটিলো না কভু!
কেবল চুলের গন্ধ, শয্যা ক্ষুধাতুর,
শুধু সৌন্দর্যের কশা—কষায়-মধুর!
উঠিলো গভীর রাত্রে দ্বাদশীর চাঁদ—
অখণ্ড দিগন্তে হেরি ঘেরা দোঁহে তবু।

৮৭. বলো, বলো, বলো

তুমি আমার মনের কথা জেনে ফেলেছো
ওইখানে তোমার জিৎ।
আমি তোমার মনের কথা
জানতে পারলাম কই?
আপন অন্তরের অগাধ রহস্যের মধ্যে ব'সে আছো
অমাবস্যার করপুটে
দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলাটির মতো,
ঠিক একটুকু আলো
যাতে দেখা না-দিয়েও দেখতে পারো অনায়াসে।
সত্যি তোমায় জানতে পারলাম কই?
যদি বলি তোমায় ভালোবাসি,
তুমি হাসো।

যদি শুধাই আমায় ভালোবাসো ?
বলো—না।
এত নিশ্চিত, এত অসংশয়।
মরুভূমির সূর্যোদয়ও বুঝি
এত নিষ্কলুষ নয়।
যদি বলি কেন ভালোবাসো না ?
অমনি বলো কেনর উত্তর নেই।
এত দিনেও ওই প্রশ্নটির উত্তর পেলাম না।
ছোটো একটি প্রশ্নের কী মহতী সম্ভাবনা।
কেবলি শুধাই কেন, কেন, কেন ?
কেবলি উত্তর পাই, কেনর আবার উত্তর কী ?
ওই উত্তরহীন উত্তর দেবার সময়ে
কখনো মুখ তুলে চাওনি।
হঠাৎ একদিন চোখে-চোখে গেলো ঠেকে,
প্রত্যাশিত উত্তর গেলো বেধে,
শুধু বললে—তুমি না কবি ?
বললে, কবিরা নাকি অন্তর্যামী।

না গো না, তবে আমিও বলি,
আমি কবি নই, শিল্পী নই,
আমি অন্তর্যামী নই।
আমি মনের কথা মুখে শুনতে চাই
মনের কথাকে দেখতে চাই
তোমার দুই চোখে প্রস্ফুটিত
মানস-সরের অন্তর্ভেদী
উন্মত, উদগত, পূর্ণায়ত পদ্মটির মতো।
আমি মনের কথাকে দেখতে চাই
তোমার সর্বাঙ্গে প্রতিফলিত,
তোমার বসনে ভূষণে,

নয়নে অধরে,
তোমার সিঁথির সীমান্ত থেকে
পায়ের নখাগ্র অবধি
সূর্যকিরণে কচি নারিকেলগুচ্ছ
যেমন চোখ ঝলসিয়ে দিতে থাকে, তেমনি।
প্রসারিত পদ্মপত্রের মসৃণ নীলিমায়
সেই কথাটি টলোমলো ক'রে উঠুক
তোমার অন্তরের শুক্তিনিঃসৃত
একটিমাত্র মুক্তোর মতো—
বলো, বলো, বলো ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (জ. ১৯০৩)

৮৮. প্রথম যখন

প্রথম যখন দেখা হয়েছিলো, কয়েছিলে মৃদুভাষে
'কোথায় তোমারে দেখেছি বলো তো,—কিছুতে মনে না আসে।
কালি পূর্ণিমা রাতে
ঘুমায়ে ছিলে কি আমার আতুর নয়নের বিছানাতে?
মোর জীবনের হে রাজপুত্র, বুকের মধ্যমণি,
প্রতি নিশ্বাসে শুনেছি তোমার স্তব্ধ পদধ্বনি!
তখনো হয়তো আঁধার কাটেনি,—সৃষ্টির শৈশব,—
এলে তরুণীর বুকে হে প্রথম অরুণের অনুভব!'
আমি বলেছিনু, 'জানি,
স্তবগুঞ্জন তুলি তোরে ঘিরে হে মোর মক্ষিরানী!'
যাপিলাম কত পরশতপ্ত রজনী নিদ্রাহীন,
দু'চোখে দু'চোখ পাতিয়া শুধালে, 'কোথা ছিলে এতদিন?'
লঘু দুটি বাহু মেলে'
মোর বলিবার আগেই বলিলে : 'যেয়ো না আমারে ফেলে।'

আজি ভাবি ব'সে বহুদিন পরে ফের যদি দেখা হয়,
তেমনি দু'চোখে বিশ্বাসাতীত জাগিবে কি বিস্ময় ?
কহিবে কি মৃদুহাসে,
'কোথায় তোমারে দেখেছি বলো তো, কিছুতে মনে না আসে ॥'

৮৯. প্রিয়া ও পৃথিবী

নিঃশঙ্ক, নিঃশব্দপদে একদিন এসেছিলে কাছে
ঈপ্সিত মৃত্যুর মতো ; নয়নে যেটুকু বহ্নি আছে,
অধরে যেটুকু ক্ষুধা—সব দিয়ে লইলাম মুছে
লোলুপ লাবণ্য তব ; দিনান্তের দুঃখ গেলো ঘুচে,
উদিলো সন্ধ্যার তারা দিগ্বধূর ললাটের টিপ।
কদম্বপ্রসব-সম জ্ব'লে ওঠে কামনাপ্রদীপ,
যুগ্ম দেহে ; শ্মশানে অতসী হাসে, নিকষে কনক ;
মেঘলগ্ন ঘনবল্লী আকুল পুলকে নিষ্পলক।
কঙ্করে অঙ্কুর জাগে, মরুভূতে ফুটিলো মালতী—
তুমি রতি মূর্তিমতী, আর আমি আনন্দ-আরতি।
দেহের ধূপতি হ'তে জ্ব'লে ওঠে বাসনার ধুনা
লেলিহরসনা, তবু কালো চোখে কোমল করুণা।
শুভ্র ভালে খেলা করে তৃতীয়ার ম্লান শিশু শশী,
তোমার বরাঙ্গ যেন সন্ধ্যাস্নিগ্ধ, শ্যামল তুলসী।
ভুজের ভুজঙ্গতলে হে নতাঙ্গী, নির্ভয় নির্ভরে
তোমার স্তনাগ্রচূড়া কাঁপিলো নিবিড় থরথরে।
স্ফুরৎপ্রবাল ওষ্ঠে গূঢ়ফণা চুম্বন-উৎসুক,
একপারে রক্তাশোক, অন্য তটে হিংস্রক কিংশুক।
শ্লথ হ'লো নীবিবন্ধ, চূর্ণালক, শিথিল কিঙ্কিণী,
কজ্জলে মলিন হ'লো পাণ্ডু গণ্ড, কাটিলো যামিনী।
দূরে বুঝি দেখা দিলো দিগ্বালার রজত-বলয়,
বলিলাম কানে-কানে : 'মরণের মধুর সময়।'

আজি তুমি পলাতকা, মুক্তপক্ষ পাখি উদাসীন,
ক্লান্ত, দূর নভোচারী দিগন্তের সীমান্তে বিলীন।
বিদ্যুৎ ফুরায়ে গেছে, কখন বিদায় নিলো মেঘ,
অবিচল শূন্যতার নভোব্যাপী নিস্তব্ধ উদ্বেগ
আবরিয়া রহিয়াছে হৃদয়ের অনন্ত পরিধি।
চাহি না ঘৃণিত মৃত্যু, তব গুপ্ত, হীন প্রতিনিধি।
নীবিবন্ধ শিথিলিতে কটিতটে যদিও কিঙ্কিণী
বাজে আজো, কজ্জলে মলিন গণ্ড, তবু, কলঙ্কিনী,
চাহি না অতীত মৃত্যু। নভস্তলে অনিবদ্ধনীবি
ঘুম যায় পার্শ্বে মোর বীরভোগ্যা প্রেয়সী পৃথিবী।
তারে চাই ; তাহারি সুধার তরে অসাধ্য সাধনা,
বিস্মিত আকাশ ঘিরি' সুস্মিত, সুনীল অভ্যর্থনা,
অজস্র প্রশ্রয়। মৃত্তিকার উদ্বেলিত পয়োধরে
সম্ভোগের সুরাস্রোত ওষ্ঠাধরে উচ্ছ্বসিয়া পড়ে,
শস্য ফলে, নদী বহে, ঊর্ধ্বে জাগে উত্তুঙ্গ পর্বত,
হাস্য করে মৌনমুখে উলঙ্গ, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।
আয়ুর সমুদ্র মোর দুই চক্ষে, মৃত্যু পদলীন,
তোমার বিস্মৃতি দিয়া পৃথিবীরে করেছি রঙিন।
নক্ষত্র-আলোক হ'তে সমুদ্রের তরঙ্গ অবধি
ব'হে চলে একখানি পরিপূর্ণ যৌবনের নদী।
তারি তলে করি স্নান, নাহি কূল, নাহি পরিমিতি,
তুমি নাই, আছে মুক্তি, পৃথ্বীব্যাপী প্রচুর বিস্মৃতি।

৯০. রবীন্দ্রনাথ

আমি তো ছিলাম ঘুমে,
তুমি মোর শির চুমে
গুঞ্জরিলে কী উদাত্ত মহামন্ত্র মোর কানে-কানে :

চলো রে অলস কবি
ডেকেছে মধ্যাহ্ন-রবি
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে

চমকি উঠিনু জাগি',
ওগো মৃত্যু-অনুরাগী
উন্মুখ ডানায় কোন অভিসারে দূর-পানে ধাও,
আমারো বুকের কাছে
সহসা যে পাখা নাচে—
ঝড়ের ঝাপট লেগে হয়েছে সে উন্মত্ত উধাও।

দেখি চন্দ্র-সূর্য-তারা
মত্ত নৃত্যে দিশাহারা,
দামাল যে তৃণশিশু, নীহারিকা হয়েছে বিবাগী,
তোমার দূরের সুরে
সকলি চলেছে উড়ে
অনির্ণীত অনিশ্চিত অপ্রমেয় অসীমের লাগি'।

আমারে জাগায়ে দিলে,
চেয়ে দেখি এ-নিখিলে
সন্ধ্যা, উষা, বিভাবরী, বসুন্ধরা-বধূ বৈরাগিণী ;
জলে স্থলে নভতলে
গতির আগুন জ্বলে
কূল হ'তে নিলো মোরে সর্বনাশা গতির তটিনী।

তুমি ছাড়া কে পারিতো
নিয়ে যেতে অবারিত
মরণের মহাকাশে মহেন্দ্রের মন্দির-সন্ধানে ;

তুমি ছাড়া আর কার
এ-উদাত্ত হাহাকার—
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (জ. ১৯০৪)

৯১. আমি কবি যত কামারের

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের
—আমি কবি যত ইতরের!

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের;
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই!

মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত
সাগর মাগিছে হাল,
পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু,
মানুষের লাগি' কাঁদিয়া কাটায় কাল,
দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়,
নেহারি আলসে নিখিলমাধুরী
সময় নাই যে হায়!

মাটির বাসনা পুরাতে ঘুরাই
কুম্ভকারের চাকা,
আকাশের ডাকে গড়ি আর মেলি
দুঃসাহসের পাখা,

অভ্রংলিহ মিনার-দন্ত তুলি',
ধরণীর গূঢ় আশায় দেখাই উদ্ধত অঙ্গুলি!

(জাফরি-কাটানো জানালায় বুঝি
পড়ে জ্যোৎস্নার ছায়া,
প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গ
ঘনায় নিশীথ-মায়া।
দীপহীন ঘরে আধো নিমীলিত
সে-দুটি আঁখির কোলে,
বুঝি দুটি ফোঁটা অশ্রুজলের
মধুর মিনতি দোলে।)
সে-মিনতি রাখি সময় যে হায় নাই,
বিশ্বকর্মা যেথায় মত্ত কর্মে হাজার করে
সেথা যে চারণ চাই!

আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের, মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের।

কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই
ছুতোরের ধরি তুরপুন,
কোন সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ।
পাল তুলে দিয়ে কোন সে সাগরে,
হাল ফেলি কোন দরিয়ায়;
কোন সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ,
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই
কুঠার-ঘায়।

সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি আর
খাল কাটি তাই, পথ বানাই,
স্বপ্নবাসরে বিরহিণী বাতি
মিছে সারারাতি পথ চায়,
হায় সময় নাই !

৯২. নীল দিন

কত বৃষ্টি হ'য়ে গেছে,
কত ঝড়, অন্ধকার, মেঘ,
আকাশ কি সব মনে রাখে !
আমারও হৃদয় তাই
সব কিছু ভুলে গিয়ে
হ'লো আজ সুনীল উৎসব !

তুমি আছো, তুমি আছো,
এ-বিস্ময় সওয়া যায় নাকো ;
অরণ্য কাঁপিছে।
মনে-মনে নাম বলি,
আকাশ চুঁইয়ে পড়ে
গলানো সোনার মতো রোদ

গলানো সোনার মতো
রোদ পড়ে সব ভাবনায় ;
সোনার পাখায়
গাহন করিতে ওঠে
নীল বাতাসের স্রোতে
রৌদ্রমত্ত পায়রার ঝাঁক।

এ-নীল দিনের শেষে
হয়তো জমিয়া আছে
সূর্য-মোছা মেঘ রাশি-রাশি ;
তবু আজ হৃদয়ের
ভরিয়া নিলাম পাত্র
এই নীল স্বপ্নের সুধায়।

হৃদয়েরে কত পাকে
স্মরণ জড়ায়ে রাখে,
মরণ শাসায়।
তবু মুহূর্তের ভুল
ক্ষীণায়ু স্ফুলিঙ্গ তবু
অন্ধকারে হাসিয়া উঠুক।

শীতল শূন্যতা হ'তে
উল্কা আসে পৃথিবীর
নিষ্করুণ নিশ্বাসে জ্বলিতে,
'স্টেপি'র দিগন্তে দেখি
আগু-পিছু তুষারের
মাঝখানে ফুলের প্লাবন।

তোমার নয়ন হ'তে
আজিকার নীল দিন
জীবনের দিগন্তে ছড়ায় ;
মিছে আজ হৃদয়েরে
স্মরণ জড়াতে চায়
মরণ শাসায়।

৯৩. ফেরারি ফৌজ

নীলনদীতট থেকে সিন্ধু-উপত্যকা,
সুমের আক্কাড আর গাঢ় পীত হোয়াংহোর তীরে,
বার-বার নানা শতাব্দীর
আকাশ উঠেছে জ্ব'লে, ঝলসিত যাদের উষ্ণীষে,
সেই সব সেনাদের
চিনি, আমি চিনি ;
—সূর্যসেনা তারা,
রাত্রির সাম্রাজ্যে আজো
সন্তর্পণে ফিরিছে ফেরারি।

মাঝরাতে একদিন
বিছানায় জেগে উঠে ব'সে,
সচকিত হ'য়ে তারা
শুনেছে কোথায় শিঙা বাজে,
সাজো-সাজো, ডাকে কোন অলক্ষ্য আদেশ।

জনে-জনে যুগে-যুগে
বার হ'য়ে এসেছে উঠানে,
আগামী দিনের সূর্য দেখেছে আঁধারে
গুঁড়ো-গুঁড়ো ক'রে সারা আকাশে ছড়ানো।

সহসা জেনেছে তারা,
এই সব সূর্য-কণা তিল-তিল ক'রে
ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে কালের দিগন্তে,
রাত্রির শাসন-ভাঙা
ভয়ংকর চক্রান্তের গুপ্তচর রূপে।

এক-একটি সূর্য-কণা তুলে নিয়ে বুকে,
দুরাশার তুরঙ্গে সওয়ার
দুর্গম যুগান্ত-মরু পার হবে ব'লে,
তারা সব হয়েছে বাহির।

সুদূর সীমান্ত হায়
তারপর স'রে গেছে প্রতি পায়ে-পায়ে ;
গাঢ় কুজ্‌ঝটিকা এসে
মুছে দিয়ে গেছে সব পথ ;
ভয়ের তুফান-তোলা রাত্রির ভ্রূকুটি
হেনেছে হিংসার বজ্র।
দিগ্বিদিক-ভোলানো আঁধারে
কে কোথায় গিয়েছে হারিয়ে।

রাত্রির সাম্রাজ্য তাই এখনো অটুট !
ছড়ানো সূর্যের কণা
জড়ো ক'রে যারা
জ্বালাবে নতুন দিন,
তারা আজো পলাতক,
দলছাড়া ঘুরে ফেরে দেশে আর কালে।

তবু সূর্য-কণা বুঝি হারাবার নয়।
থেকে-থেকে জ্ব'লে ওঠে শাণিত বিদ্যুৎ
কত ম্লান শতাব্দীর প্রহর ধাঁধিয়ে
কোথা কোন লুকানো কৃপাণে
ফেরারি সেনার।

এখনো ফেরারি কেন ?
ফেরো সব পলাতক সেনা।

সাত সাগরের তীরে
ফৌজদার হেঁকে যায় শোনো ;
আনো সব সূর্য-কণা
রাত্রি-মোছা চক্রান্তের প্রকাণ্ড প্রান্তরে।
—এবার অজ্ঞাতবাস শেষ হ'লো ফেরারি ফৌজের।

৯৪. কাক ডাকে

খাঁখাঁ রোদ, নিস্তব্ধ দুপুর ;
আকাশ উপুড় ক'রে ঢেলে-দেওয়া
অসীম শূন্যতা,
পৃথিবীর মাঠে আর মনে—
তারই মাঝে শুনি ডাকে
শুষ্ককণ্ঠ কাক!
গান নয়, সুর নয়,
প্রেম, হিংসা, ক্ষুধা—কিছু নয়,
—সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্তি শুধু।

মানুষের কথা বুঝি শুনেছি সকলই ;
মনের অরণ্যে যত হাওয়া তোলে
কথার মর্মর,
বেদনা ও ভালোবাসা
উদ্দীপনা, আশা ও আক্রোশ,
জেনেছি সমস্ত দোলা।
সব ঝড় পাড় হ'য়ে, আছে এক
শব্দের নীলিমা,
অন্তহীন, নিষ্কম্প্র, নির্মল।

কোথায় কাদের ছাদে সমস্ত দুপুর
কাক ডাকে, শুনি।

বোঝা আর বোঝাবার
প্রাণান্ত ক্লান্তির শেষে
অকস্মাৎ খুলে যায় আশ্চর্য কবাট।
কাক ডাকে, আর,
সে-শব্দের ধু-ধু-করা অপার বিস্তার
হৃদয়ে ছড়ায় সব শব্দের অতীত
ধ্যান-গাঢ় প্রশান্তির মতো।

আবার বিকেল হবে,
রোদ যাবে প'ড়ে,
মানুষ মুখর হবে
মাঠে আর ঘরে।
বোঝাপড়া লেনদেন
প্রত্যহের প্রসঙ্গ প্রচুর
মন জুড়ে র'বে।
ক্ষণে-ক্ষণে তবু সব সুর
কেটে দিতে পারে এক কাক-ডাকা গহন দুপুর
সমস্ত অর্থের গ্রন্থি ধীরে-ধীরে খুলে,
প্রত্যহের ভাষা তার সব ভার ভুলে,
উত্তরিতে পারে এক নিষ্কম্প্র নিথর
নভোনীল অপার বিস্ময়ে!

৯৫. পাখিদের মন

নির্জন প্রান্তরে ঘুরে হঠাৎ কখন,
হয়তো পেতেও পারি পাখিদের মন।
আর শুধু মাটি নয় শস্য নয়,
নয় শুধু ভার,
আর-এক বিদ্রোহী ধিক্কার—
পৃথিবী-পরাস্ত-করা উজ্জ্বল উৎক্ষেপ।

আজো এরা মাঠে-ঘাটে মাটি খুঁটে খায়,
মেনে নেয় সব কিছু দায় ;
তবু এক সুনীল শপথ
তাদের বুকের রক্ত তপ্ত ক'রে রাখে।
জীবনের বাঁকে-বাঁকে, যত গ্লানি যত কোলাহল
ব্যাধের গুলির মতো বুকে বিঁধে রয়,
সে-উত্তাপে গ'লে গিয়ে হ'য়ে যায় ক্ষয়।
শুধু দুটি তীব্র তীক্ষ্ণ দুঃসাহসী ডানা,
আকাশের মানে না সীমানা।
কোনোদিন এ-হৃদয় হয় যদি একান্ত নির্জন,
হয়তো পেতেও পারি পাখিদের মন
—আর এক সূর্য-সচেতন।

৯৬. নীলকণ্ঠ

হাওয়াই দ্বীপে যাইনি, দক্ষিণ সমুদ্রের কোনো দ্বীপপুঞ্জে।
তবু চিনি ঘাসের ঘাগরাপরা ছায়াবরন তার সুন্দরীদের ;
—বিদেশী টহলদারের ক্যামেরা-কলুষিত চোখে নয়।
দেখেছি তাদের ঘাসের ঘাগরায় নাচের ঢেউয়ের হিল্লোল,
নোনা হাওয়ার দমকে-দমকে যেমন নারকেল-বনের দোলা।
মোহিনী পলিনেশিয়া!
মহাসাগরে ছড়ানো
ভেঙে-যাওয়া ভুলে-যাওয়া কোন সুদূর সভ্যতার নাকি ভগ্নাংশ।
আমি জানি,
সমুদ্রের ঔরসে
প্রবালদ্বীপের গর্ভে তার জন্ম।
সূর্যের ঔরসে
মহারণ্যের গর্ভে যার জন্ম,
আঁধার-বরন সেই আফ্রিকাকেও জানি ;
—শৌখিন শিকারি আর পণ্ডিত-পর্যটকের চোখে নয়।

অরণ্য-চোঁয়ানো ঝাপসা আলোয়,
কি, দিগন্ত-ছোঁয়া ফেণ্টের চোথ-ঝলসানো উজ্জ্বলতায়
উদ্দাম আঁধার-বরন আফ্রিকা !
কণ্ঠে তার দুরন্ত আরণ্য উল্লাস
—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই !

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই !
কালো চামড়ার ছোঁয়াচ বাঁচাতে
কালো মনের ছোঁয়াচে রোগে জর্জর
মার্কিন ক্লীবের প্রলাপ-প্রতিধ্বনি নয়।
রাত্রি-নিবিড়, অরণ্য-গহন আফ্রিকার
রোমাঞ্চিত উত্তাল উচ্চারণ,
—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই !

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই !
অরণ্য ডাকে ওই,—যাই !
সিংহের দাঁতে ধার, সিংহের নখে ধার
চোখে তার মৃত্যুর রোশনাই
—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই !
বন-পথে বিভীষিকা বিঘ্ন,
আমাদেরও বল্লম তীক্ষ্ণ !
কাপুরুষ সিংহ তো মারতেই জানে শুধু
আমরা যে মরতেও চাই !
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই !

মেয়েদের চোখ আজ চকচকে ধারালো ;
নেচে-নেচে ঢেউ-তোলা, নাচের নেশায় দোলা
মিশকালো অঙ্গে কি চেকনাই।
মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হ'য়ে গেছি সব
রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই !
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই !

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
আমাদের গলায় কই সেই উদ্দাম উল্লাস,
ঘাসের ঘাগরার দুরন্ত সমুদ্র-দোলা?
কেমন ক'রে থাকবে!
আমাদের জীবনে নেই জলন্ত মৃত্যু,
সমুদ্র-নীল মৃত্যু পলিনেশিয়ার!
আফ্রিকার সিংহ-হিংস্র মৃত্যু!
আছে শুধু স্তিমিত হ'য়ে নিভে যাওয়া,
—ফ্যাকাশে রুগ্ন তাই সভ্যতা।

সভ্যতাকে সুস্থ করো, করো সার্থক।
আনো তীব্র তপ্ত ঝাঁঝালো মৃত্যুর স্বাদ,
সূর্য আর সমুদ্রের ঔরসে
যাদের জন্ম,
মৃত্যু মাতাল তাদের রক্তের বিনিময়।

ভরাট-করা সমুদ্র আর উচ্ছেদ-করা অরণ্যের জগতে
কী লাভ গ'ড়ে কৃমি-কীটের সভ্যতা,
লালন ক'রে স্তিমিত দীর্ঘ পরমায়ু
কচ্ছপের মতো?
অ্যামিবারও তো মৃত্যু নেই।
মৃত্যু জীবনের শেষ সার আবিষ্কার
আর
শিব নীলকণ্ঠ!

অন্নদাশঙ্কর রায় (জ ১৯০৪)

৯৭. 'জর্নাল' থেকে

পদ্মার চর

সারাদিন ভর পদে-পদে ব্যর্থতা
তিক্ত মনের বিরস রুক্ষ কথা।
আনন্দ আশা তিলে-তিলে লাঞ্ছিত—
এই কি মোদের বহুদিবাবাঞ্ছিত
পদ্মার চরে বাস।

নির্জন দ্বীপ, ভেক মক-মক করে
আকাশ জ্বলিছে তারার সলিতা ধ'রে
জলের সঙ্গ জাগায় কী অনুভব
মৃদু তালে বাজে কল্লোল কলরব
বায়ু বহে উচ্ছ্বাস।

মেঘ বেগ

গুরু মন্থর মেঘের সঙ্গে লঘু চঞ্চল মেঘের
নভপ্রাঙ্গণে বায়ুরথে আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেগের।
ঘর্ষণে ওঠে ঘর্ঘর রব তাহার সঙ্গে মেশা
রথতুরঙ্গ ধাবনরভসে সঘনে ছাড়ে যে হ্রেষা।
খুরেতে চাকায় চকমকি ঠোকে ফুলকি ছোটায় ছড়ায়
ব্যোম মার্গের দীপ্তি সে আসি' দিক ব'লে দেয় ধরায়॥

কবির প্রার্থনা

রহুক আমার কাব্যে বালার্কময়ূখচ্ছটা শতবর্ষ মেঘ,
বিহঙ্গের গীতিমুক্তি বনস্পতিপরমায়ু মৃত্তিকার রস,
শিশিরের স্বচ্ছ সুখ, শিশুর শুচিতা, পশুদের নিরুদ্বেগ,
সর্বশেষে শর্বরীর প্রশান্ত অম্বরতলে নারীর পরশ॥

৯৮. 'রাখী'র উৎসর্গ

আমরা দুজনা দুই কাননের পাখি
একটি রজনী একটি শাখার শাখি
তোমায় আমায় মিল নাই, মিল নাই
তাই বাঁধিলাম রাখী।

৯৯. দিলীপদাকে

তোমায় বলেছি পলাতক, ব'লে হেসেছি কত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
তুমি তো পালালে সংসার হ'তে সুসংযত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
আমি পলাতক সংগ্রাম হ'তে ভীরুর মতো!
আমি রণছোড়, টিটকারি দেয় পুরুষ যত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
বলে, কাপুরুষ! গম্বুজে ব'সে বাক্যরত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
আমারি উক্তি আমারি কর্ণে বর্ষে শত!

ওদের কী বলি, কী ক'রে বোঝাই! শরমে নত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
জীবনের লোভে নই পলাতক সুদূরগত!
নিয়তি আমার নিয়তি!
সৃষ্টির প্রেমে দৃষ্টি আমার প্রত্যাহত!

১০০. খুকু ও খোকা

তেলের শিশি ভাঙলো ব'লে
খুকুর 'পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

ভাঙছো প্রদেশ ভাঙছো জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ি
পাটের আড়ৎ ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ি !
তার বেলা ?

চায়ের বাগান কয়লাখনি
কলেজ থানা আপিশ-ঘর
চেয়ার টেবিল দেয়াল ঘড়ি
পিয়ন পুলিশ প্রোফেসর !
তার বেলা ?

যুদ্ধ-জাহাজ জঙ্গী মোটর
কামান বিমান অশ্ব উট
ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির
চলছে যেন হরির-লুট !
তার বেলা ?

তেলের শিশি ভাঙলো ব'লে
খুকুর 'পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাংলা ভেঙে ভাগ করো !
তার বেলা ?

১০১. কাঁদুনি

মশায় !
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায় !

বাঘ নয় ভালুক নয়
নয়কো জাপানি,
বোমা নয় কামান নয়
পিলে কাঁপানি।

মশা!
ক্ষুদ্র মশা!
মশার কামড় খেয়ে আমার
স্বর্গে যাবার দশা।
মশারি তো মশার অরি
শুনেছি কাহিনী
দুশমনকে দোর খুলে দেয়
পঞ্চম বাহিনী।
একাই জনযুদ্ধ করি
এ-হাতে ও-হাতে,
দুই হাতেরই চাপড় বাজে
নাকের ডগাতে।

একাই
মশার কামড় নিজের চাপড়
কেমন ক'রে ঠেকাই।
শেষে
ম্যালেরিয়ায় ধরলে আমায়
একেবারে ঠেসে।

মশায়!
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়।
কেশনগরের মশার সাথে
তুলনা কার চালাই?

বাঘের গায়ে বসলে মশা
বাঘ বলে সে "পালাই।"
জাপানিরা ভাগলো কেন
খবরটা কি রাখেন ?
কেশনগরের মশার মামা
ইম্ফলেতে থাকেন।

পলাশির সেই লড়াই যদি
কেশনগরে ঘটতো
কেশনগরের মশার ঠেলায়
ক্লাইভ সেদিন হঠতো।

মশা
তুচ্ছ মশা !
মশার জ্বালায় সেদিন হ'তো
ডানকার্কের দশা
মশায় !
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায় !

হেমচন্দ্র বাগচী (জ. ১৯০৪)

১০২. 'গীতিগুচ্ছ' থেকে

চেয়ে-চেয়ে দেখি

কতদিন চেয়ে দেখি
চোখে রঙের নেশা লাগে—
বর্ষার ভরা নদী, কাশফুল,
মাঝে-মাঝে এক-একখানি নৌকো ভেসে চলেছে,
গাঁয়ের লোকগুলি চলেছে নিঃশব্দে।

দেখি, আর মনে হয়—
এ যেন পৃথিবীর অর্ধাবগুণ্ঠিত রহস্যময় মুখ
নেপথ্যে চলেছে অযুত আয়োজন
এই চিত্রটিকে তুলে ধরবার জন্য।

বর্ষার দিনে

বর্ষার দিনে গঙ্গার তটরেখায়-রেখায়
চলেছে আমার মন।
বাবলাগাছের হরিদ্রাভ ফুল—
অসংখ্য পাখির একতান ঝংকার
শালিখ পাখির মেলা।—
এই শ্যামল শোভার মধ্যেও
হৃদয়ের কান্না থামে না কিছুতেই।

বড়ো সুন্দর এই পৃথিবী

বড়ো সুন্দর এই পৃথিবী।
সাধ যায় এই
অপরূপ সবুজ শোভার মধ্যে
বেঁচে থাকি কিছুকাল।
শুধু দেখি, আর স্বপ্নের মায়াভুবন
রচনা করি
অগণন মুহূর্তের ফাঁকে-ফাঁকে।

মনে হয় যেন ছুটি পেয়েছি
সমস্ত চিরাচরিত মানব-পন্থা থেকে
মুক্তি পেয়েছি আমার মনে।
ভিতরের মানুষটাকে কে জানে?
সে শুধু বীণা বাজায় আর গান গায়

আর উদাসীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে
যেখানে শ্যামল বনের অন্তরালে
ভীরু কাঠবিড়ালি ত্বরিত গতিতে
যাওয়া-আসা করে নিঃশঙ্ক, নিঃসংকোচ

প্রচ্ছন্না

এক-এক সময় অনুভব করি
পৃথিবীর বক্ষবিদারণ যে-স্বত-উৎসারিত রসধারা,
আমি যেন তারই প্রান্তরেখায় বিস্মিতদৃষ্টি বালকের মতো ব'সে আছি।
চিরকাল যেন স্তম্ভিত হ'য়ে আছে
আমার সেই মুহূর্তদর্শনের কাছে।
মনে-মনে বলি,
হে প্রচ্ছন্না, তোমার গুণ্ঠন আর অপসারিত কোরো না
অত প্রখরতা সইবো কী ক'রে?

ভাঙা কোঠাবাড়ি

অনেক দিনের ভাঙা কোঠাবাড়ি
কাঁঠাল আম নারকেলের বাগান,
তারই ফাঁকে-ফাঁকে দেখি
একটি মেয়েকে
শ্যামল বনশোভার মতো,
মনের পীড়া যে দূর করে,
এমন মেয়ে।

একটি ছোটো পতঙ্গ

কোথায় একটি ছোটো পতঙ্গ বাসা বাঁধছে
জামগাছের শুকনো কাঠের ভিতরে

তার সেই ক্লান্তিহীন কর্মের তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দ এসে লাগছে
আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে।
অপরূপ শরৎপ্রভাতে সেই শব্দ আমার কত ভালোই না লাগছে!
ছোট্ট একটি পাখি বারে-বারে ডাকছে—
কুকলি-কুকলি।
মনে হয়, এই উপেক্ষিত আবেষ্টনীর মধ্যে সঞ্চিত হ'য়ে আছে চিরযুগের মধু—
তা আমাদের কর্মক্লান্ত দৃষ্টির নেপথ্যে।

১০৩. "স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু"

প্রতি রাত্রে আমি হংসপদিকার গান শুনি
বিরহিণী হংসপদিকা—
বহুবল্লভ দুষ্মন্তের শুদ্ধান্তবিহারিণী।
স্বপ্নে আমি চ'লে যাই কালিদাসের কালে
যখন নদী-কান্তার-নগরীতে সমাচ্ছন্ন সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ,
কবির কাব্য যখন মেঘলোক থেকে মাটির পৃথিবীকে
প্রিয়ার পদনখের সঙ্গে উপমা দিতে অধীর—
স্বপ্নে আমি সেই কালে অবতীর্ণ হই
আর গান শুনি হংসপদিকার—
রাজ-উপবনে বিরহিণী নারীর মৃদু গুঞ্জরণ,
মনে হয়, এ স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম?

প্রতিরাত্রে আমি আমার প্রিয়তমার গান শুনি
প্রোষিতভর্তৃকা প্রিয়তমা—
গৃহবাতায়নপার্শ্ববর্তিনী কল্যাণী বধূ—
স্বপ্নে আমি নেমে আসি আধুনিকের কালে
যখন পীড়াজর্জর ত্রস্ত জীবনে অবসর দুর্লভ,
কবির কাব্যে যখন আর প্রিয়া নেই
প্রিয়ার পদনখ যখন আর সম্মানিত হয় না কবির কাব্যে
বিচিত্র সুন্দর উপমায় আর অলংকারে;—
তখন আমি গান শুনি—

ভীত দাসজীবনের গান—
কঙ্করে আর তপ্ত মরুবালুকায়
দুঃখিনী প্রিয়তমার মুখের রেখা অঙ্কন করি,
মনে হয়, এ বিরহ, না মিলন, না মৃত্যু ?

রাধারানী দেবী

(জ. ১৯০৪)

১০৪. 'সিঁথি-মৌর' থেকে

তোমারে বাসিয়া ভালো পূর্ণ আমি আজ।
মোর চিত্তলোকে নাহি কোনো দৈন্য আর।
হে বন্ধু ! হৃদয়াকাশে করিছে বিরাজ
পূর্ণতার পূর্ণচন্দ্র। নিখিল সংসার
আনন্দ আলোকে দীপ্ত আমার নয়নে ;
কোনো দুঃখ দুঃখ নয়, বাজে না আঘাত ;
সংসারের ক্রূরতায় জ্বালা নাহি মনে।
বিধাতা আপনি যেন নিরাময় হাত
বুলাইয়া দিয়াছেন তপ্ত এ-অন্তরে
অনুভূতি-কেন্দ্রে মোর। তাই সর্ব দুখ
নিজ হ'তে তুচ্ছ হ'য়ে পড়ে ঝ'রে-ঝ'রে
বেদনা আনন্দ মানি, দুঃখে মানি সুখ।
কী অদৃশ্য মহাশক্তি জাগে বিশ্ব-'পর
অন্তরে ঘটায় যেবা নব-জন্মান্তর।

১০৫.

আমার হৃদয়দ্বারে এসেছিলো যারা
প্রার্থীরূপে বহুবার, ঐশ্বর্য সম্মান
ল'য়ে করপুটে কেহ,—কেহ প্রেমগান
রূপ-যৌবনের অর্ঘ্য চরণে বা কারা।
অনেকে চেয়েছে বন্ধু হ'য়ে আত্মহারা ;
বিতৃষ্ণায় গেছে ভ'রে বারংবার প্রাণ

সবারে করেছি তাই রূঢ় অপমান;
গেছে ফিরে লাজে ক্ষোভে অভিমানে তারা।
তাদের কাঙালপনা অঞ্জলিপ্রসার
জাগাইত ঘৃণা মোর। পণ্যবৃত্তি সম
দান করি' বিনিময়ে প্রতিদান চাওয়া
তুলিত বিরূপ করি' অন্তর আমার।
তুমি চাহো নাই কিছু দ্বারে এসে মম
পূর্ণ হ'লো তাই তব অযাচিত পাওয়া।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (জ. ১৯০৬

১০৬. তির্যক

তির্যক সবি, পৃথিবী মানুষ—
প্রাচ্য নৃত্য, কবির ফানুস
আধো পথে নেমে মিলায় আভাসে
কুটিল রেখায় ভঙ্গুর হাসে।

যুযুৎসু জানে নায়ক-নায়িকা আত্মরত
বিতত বন্ধে কাব্যেরও প্রাণ ওষ্ঠাগত।
বাঁকানো সিঁথিতে সিন্দূর রাঙা
বঙ্কিম ঠোঁটে ফোটে হাসি ভাঙা।
সর্পিল গ্রীবা শ্লেষ-চতুর
মীড়ের মোচড়ে আনে বেসুর।

চোখের কোণেতে তেরছা রঙ্গ
সুদূর চাঁদের শৃঙ্গ-ভঙ্গ।
চিত-চঞ্চরী রমণী নম্র,
ফুলভাল হায় কটি-বিলম্ব!

সবি হেথা সূচীমুখ
ধ্বনি ব্যঞ্জনা আলোচনা আর কবিতা প্রণয়-রীতি
শুধু লাগে অহেতুক
হুল-ফোটানোর মন্তর-জানা গৌড়ী রসের প্রীতি।

হুমায়ুন কবির (জ. ১৯০৬)

১০৭. সনেট

১

যে-শান্তি গৃহের কোণে স্নেহস্নিগ্ধ ছায়া
মেলি' রচে ধরাতলে অমরার মায়া,
পরিজন প্রীতিপুষ্প অম্লান সৌরভে
ভরি' দেয় এ-জীবন আনন্দ-গৌরবে,
দিন হ'তে দিনান্তের অনাহত গতি
নীরবে তটিনী-সম খোঁজে পরিণতি
অন্তহীন প্রশান্ত সে কোন সিন্ধুবুকে,—
সে নহে আমার লাগি'।
নিয়ত সম্মুখে
বৈশাখ ঝটিকা যবে দুর্নিবার বেগে
বারি-বজ্র-অগ্নিগর্ভ ঘনকৃষ্ণ মেঘে
হেলায় ভাসায়ে চলে—আসন্ন ঝটিকা
বক্ষে করি' তবু জ্বলে যেই দীপশিখা
তারি চিত্তে শঙ্কাকুল সেই শান্তি-সম
শান্তিতে ভরিয়া যাক এ-জীবন মম।

২

শুনিনু নিদ্রার ঘোরে অযোধ্যার নাম।
হেরিলাম স্বর্ণপুরী। পথে-পথে তার
শত-শত নরনারী কাঁদে অবিরাম,
আর্তকণ্ঠে নভোতলে ওঠে হাহাকার।

তরুণ দেবতা সম কিশোর কুমার
যৌবনে সন্ন্যাসী সাজি' চলিয়াছে বনে,—
সীতার বিরহ-ভয়ে পুরী অন্ধকার,
গগন শ্বসিয়া ওঠে নিরুদ্ধ ক্রন্দনে।
চমকি' উঠিনু জাগি'। তপ্ত নিদাঘের
মূর্ছিত ভুবন ভরি' রৌদ্রানল জ্বলে।
স্টেশন-অঙ্গনে ডাকে গ্রীষ্মাতুর স্বরে
অযোধ্যার নাম। ধূসর ধুলির 'পরে
ব'সে আছে বানরের দল। দূরে ঝলে
সূর্যালোকে স্বর্ণচূড়া ভগ্ন মন্দিরের।

অজিত দত্ত (জ. ১৯০৭)

১০৮. যেখানে রুপালি

যেখানে রুপালি ঢেউয়ে দুলিছে ময়ূরপঙ্খী নাও,
যে-দেশে রাজার ছেলে কুমারীকে দেখিছে স্বপনে,
কুঁচের বরন কন্যা একাকী বসিয়া বাতায়নে
চুল এলায়েছে যেথা—কালো আঁখি সুদূরে উধাও;
যে-দেশে পাষাণ-পুরী, মানুষের চোখের পাতাও
অযুত বৎসরে যেথা নাহি কাঁপে ঈষৎ স্পন্দনে,
হীরার কুসুম ফলে যে-দেশের সোনার কাননে,
কখনো, আমার পরে, তুমি যদি সেই রাজ্যে যাও;

তাহ'লে, তোমারে কহি, সে-দেশে যে-পাশাবতী আছে,
মায়ার পাশাতে যেই জিনে লয় মানুষের প্রাণ,
মোহিনী সে-অপরূপ রূপময়ী মায়াবীর কাছে
কহিয়া আমার নাম শুধাইয়ো আমার সন্ধান;
সাবধানে যেয়ো সেথা, চোখে তব মোহ নামে পাছে,
পাছে তার মৃদুকণ্ঠে শোনো তুমি অরণ্যের গান।

১০৯. রাঙা সন্ধ্যা

রাঙা সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশ কাঁপায়ে পাখার ঘায়
ডানা মেলে দূরে উড়ে চ'লে যায় দুটি কম্পিত কথা,
রাঙা সন্ধ্যার বহ্নির পানে দুটি কথা উড়ে যায়!

পাখার শব্দে কাঁপে হৃদয়ের প্রস্তর-স্তব্ধতা,
দূর হ'তে দূর—তবু কানে বাজে সে-পাখার স্পন্দন,
ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ, ঝড়ের মতন তবু তার মত্ততা।

চ'লে যায় তারা চোখের আড়ালে—লক্ষ কথার বন
অট্টহাস্যে কোলাহল করে, তবু ভেসে আসে কানে
পাখার ঝাপট; বজ্র ছাপায়ে এ কি অলি-গুঞ্জন?

যাযাবর যত পক্ষী-মিথুন থামে তারা কোনখানে?
মানুষের ছায়া সে-আলোর নিচে পড়েছে কি কোনোদিন?
তুমি তো আমারে ভুলে যাবে নাকো—যদি যাই সন্ধানে?

তুমি নীড়, তুমি উষ্ণ কোমল; পাখার শব্দ ক্ষীণ,
তবু সে আমারে ডাকে, ডাকে শুধু ছেদহীন, ক্ষমাহীন।

১১০. একটি কবিতার টুকরো

মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মতো চঞ্চল উদ্দাম;
মালতী, সেখানে আমি আমার স্বাক্ষর রাখিলাম।

জানি, এই পৃথিবীতে কিছুই রহে না;
শুক্ল কৃষ্ণ দুই পক্ষ বিস্তারিয়া মহা শূন্যতায়
কাল-বিহঙ্গম উড়ে যায়
অবিশ্রান্ত গতি।

পাখার ঝাপটে তার নিবে যায় উল্কার প্রদীপ,
লক্ষ-লক্ষ সবিতার জ্যোতি।
আমি সেই বায়ুস্রোতে খ'সে-পড়া পালকের মতো
আকাশের নীল শূন্যে মোর কাব্য লিখি অবিরত ;
সে-আকাশ তোমার অন্তর,
মালতী, তোমার মনে রাখিয়াছি আমার স্বাক্ষর।

১১১. মিস্—

কলঙ্ক-কঙ্কণ ভাঙো ! ও কেবল ভূষণ তোমার।
বার-বার সকলের চোখের উপরে তাই বুঝি
সেই তব কলঙ্কের ঐশ্বর্যের মহামূল্য পুঁজি
ঢঙে আর ন্যাকামিতে নানা ভাবে করিছো প্রচার।
দ্রৌপদীর কথা ভাবি' মনে আনিয়ো না অহংকার
উষাকালে তব নাম মানুষ স্মরিবে চোখ বুজি',
দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য তব, রাহুময় তোমার ঠিকুজি,
সেথায় নক্ষত্র নাই অনির্বাণ স্মরণীয়তার।

কলঙ্ক-ভূষণ খোলো ! বহু-প্রেম-গর্ব যদি চাহ—
যদি ভালোবাসিবার শক্তি থাকে, প্রিয়তম-মাঝে
ছাখো তবে পার্থ-ভীম-যুধিষ্ঠিরে, পঞ্চ পাণ্ডবেরে ;
যে-কলঙ্কে লুব্ধ করি বহু হ'তে বহুতরদেরে
ঊর্ণায় টানিতে চাও—সে-ভূষণ নারীরে না সাজে,—
বিশ্বাস করিতে পারো, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বিবাহ।

১১২. সনেট

একবার মনে হয়, দূরে—বহু দূরে—শাল, তাল,
তমাল, হিন্তাল আর পিয়ালের ছায়া-ম্লান দেশে
প্রেম বুঝি নাহি টুটে, অশ্রু বুঝি কোনোদিন এসে
আঁখি হ'তে মুছে নাহি নেয় স্বপ্ন। বুঝি এ-বিশাল

ধরণীর কোনো কোণে ফুল ফুটে রয় চিরকাল,
বসন্ত-সন্ধ্যার মোহ দক্ষিণ বাতাসে আসে ভেসে,
বুঝি সেথা রজনীর পরিতৃপ্ত প্রেমের আবেশে
প্রভাত-পদ্মের ভরে কেঁপে ওঠে তারার মৃণাল।

যদি তাই হয়, তবু সেই দেশে তুমি আর আমি
বাহুতে জড়ায়ে বাহু নাহি যাবো শান্তির সন্ধানে
মোদের জানালা-পথে ব'য়ে যাক পৃথিবীর স্রোত।
সে-স্রোতে কখনো যদি ভেসে আসে নীলাভ শরৎ
তোমার চোখের কোলে, মেঘ যদি কভু মোহ আনে,
সে-চোখে আমার পানে চেয়ো তুমি অকস্মাৎ থামি'।

১১৩. জিজ্ঞাসা

যদি ওই হৃদয়ের রঙটুকু নিয়ে কোনোদিন
বাতাস উদাস হয়, আকাশ রঙিন,—
শরতে, কি বসন্তের কুহু-কাকলিতে
নতুন জন্মের স্বাদে দুঃস্বপ্নেরে চায় মুছে দিতে,
তবে কি এ-পৃথিবীর ছদ্ম নটীবাস
শাস্ত্র শস্ত্র রাজনীতি বাণিজ্য-বিলাস
সেই মুহূর্তের অভিসারে
প্রাণের নিভৃতে এসে খ'সে প'ড়ে যাবে একেবারে?

যদি এই ভেজা মাটি শিশির দূর্বায়,
অনেক বিপথে ঘুরে পা দু-খানি পথ খুঁজে পায়—
তবে কোনো প্রান্তরের পারে,
কিংবা কোনো ভুলে-যাওয়া নদীর কিনারে,
মানুষের প্রেমের কি সংসারের বিচিত্র কাকলি,
ধূসর পাহাড়ে ঘেরা গ্রাম কিংবা শ্যাম বনস্থলী,

পুরাতন আকাশ কি পুরোনো তারারা,
ধ্যানের শাসনে পেয়ে ছাড়া
হবে নত আমার এ হৃদয়ের পুরোনো পুঁথিতে
কোনো-এক নতুন কবিতা লিখে দিতে ?

আমি সেই মুহূর্তেরে খুঁজে
শহরে, বাজারে, হাটে, মাঠের সবুজে,
কখনো অরণ্যে, কভু রাজধানী-পথে জনতায়,
ঘুরেছি অনেক ক্লান্ত পায়।
রূপকাহিনীর মায়াপুরীতে নিভৃতে,
কত সোনা-ছাওয়া দিনে, কত হীরে-ছড়ানো রাত্রিতে,
সহস্রের স্রোতে ভেসে, কখনো বা নির্জন সৈকতে,
দ্বীপে ও মরুতে আর কত তীর্থপথে,
কখনো বা মিনারের চূড়ায় দাঁড়ায়ে
দেখেছি দু-চোখে খুঁজে, সম্মুখে পশ্চাতে ডাইনে বাঁয়ে,
শুধু মনে হয়—
বুঝি সে রয়েছে কাছে, বুঝি কাছে নয়।

হ'লো কতদিন !
সকালের রোদ আজ বিকালের ছায়ায় মলিন।
তবু জানি প্রাণের সে-চরম জিজ্ঞাসা
আজো করে উত্তরের আশা
আকাশে বাতাসে চাঁদে, কখনো বা মানুষের ঘরে,
পাখির আওয়াজে আর প্রণয়ের মৃদু কণ্ঠস্বরে।
হয়তো জীবনে কিংবা জীবনেরও বড়ো কল্পনায়
সে-মুহূর্ত আছে যেন, আছে প্রতীক্ষায়॥

১১৪. নইলে

প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির ?
ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির ?

নইলে
রইলে
ট্রাম না-চ'ড়ে—
ভ্যাবাচাকা রাস্তায় প'ড়ে বেঘোরে।

প্র্যাকটিস করেছো কি দৌড়ে?
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আর ভোঁ-উড়ে?
নইলে
রইলে
লরিতে চাপা,
তাড়া ক'রে বাড়ি থেকে বাড়িয়ো না পা।

দাঁত আছে মজবুত সব বেশ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস?
নইলে
রইলে
ভাত না-খেয়ে,
চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।

স্থির ক'রে পা দুটো ও মনটা,
দাঁড়াতে পারো তো বারো ঘণ্টা?
নইলে
রইলে
না-কিনে ধুতি—
যতই দোকানে গিয়ে করো কাকুতি।

১১৫. জয়ের আগে

হে রাজপুত্র, তোমার ঘোড়ার পায়ের নিচে
কত অরণ্য-গিরি-জনপদ গুঁড়ায়ে গেছে,

নিঃসাড় এই প্রেত-পল্লীরও দগ্ধ মাঠে
ফেলিলে চরণ! মহাশ্চর্য কী আর আছে!
প্রণমি তোমারে, দিগ্বিজয়ের রাজ্যভাগ
তোমারি থাকুক, আমরা কেবল ভিক্ষা চাই—
যুদ্ধের পথ এঁকেছো যেখানে অশ্বখুরে
জয়োৎসবের পুষ্পসরণি এঁকো সেথাই।

সাত সমুদ্র তেরো নদী নখ-মুকুরে বটে,
কূপের বার্তা তত জানাশোনা হয়তো নেই,
পক্ষীরাজের চর্যা যাহার আশৈশব
ভেক-পরিচয় নহেকো তাহার আয়ত্তেই।
কাহিনী তোমার ইতিবৃত্তে রক্ষণীয়,
মিনতি মোদের, ভট্টজনেরে ভিক্ষা দিয়ো;
আমাদের শুধু দিয়ো কিঞ্চিৎ চরণ-ছায়া
এবং তোমার দর্শন অতি দর্শনীয়।

রাজার কাহিনী বহু-বিশ্রুত, প্রজার কথা
রাজভট্টের মহাকাব্যেতে ক্বচিৎ মেলে,
রাজ্যশাসনও শুনি লোকমুখে দুরূহ নয়
রাজপুরুষেরা রাজস্বর্ণের অংশ পেলে।
তাই অনুরোধ, রাজকন্যার সোহাগ ফাঁকে
অতি অভাজন প্রজাগণ-প্রতি করুণা করি'
দিয়ো একবার দর্শন—বহু বিজ্ঞাপিত,
ক্রূর বুভুক্ষা ভুলি যাতে সেই গর্ব স্মরি'।

হে রাজপুত্র, তোমার ঘোড়ার পুচ্ছ ঘেরা
মরকত আর বৈদূর্যের মালার প্রতি
করিবো না লোভ, শপথ তোমার, ঈর্ষাবশে
ভাগ্যে তোমার করিবো না রোষ, দণ্ডপতি!

বহুপ্রতীক্ষমাণা—বাঞ্ছিত হে বীরবর,
অতি দরিদ্র অভাজন মোরা ভিক্ষা চাই,
যুদ্ধের পথ এঁকেছো যেখানে অশ্বখুরে
জয়োৎসবের পুষ্পসরণি এঁকো সেথাই।

সুনীলচন্দ্র সরকার (জ. ১৯০৭)

১১৬. জামতলা

আয় চ'লে এই জামতলায়
দূর থেকে ত্থাখ বাড়িটা তোর
এদিকে জানলা ওদিকে দোর
চলন্ত ছবি ঝলমলায়।
ওদিকে বেরোয় ধোঁয়া আঁকাবাঁকা
আকাশের রোদে ফণা-তুলে-রাখা;
মেঝে ঘষ্টানি, জলের আওয়াজ,
ঘর থেকে ঘরে ঘুরে ফেরে কাজ;
বিছানা বসন বাসন বাধ্য,
তাড়ার ধমকে এগোয় খাদ্য;
পতপত ভিজে কাপড় উড়ছে
জানলার নিচে বেড়াল ঘুরছে;
'গামছা কোথায়, ঘটিটা মাজ না—'
বাজে বিচিত্র সুরের বাজনা।
ত্থাখ ব'সে এই জামতলায়
কেমন খেলনা বাড়িটা তোর,
দপদপ করে জানলা-দোর
মানুষ-খাঁচার ঢেউচলায়।

ছবির মতন লাগে মধুর
বাইরে এখানে জামতলায়

মনের বাঁধুনি এলিয়ে যায়
শীতল ছায়ায় উদাস সুর।
বাড়িতে ফিরলে এলাকা ঘড়ির,
খুচরো চলন পয়সা-কড়ির,
খুঁটিনাটি আর এটাতে-ওটাতে
পুরোনো অভাব নতুন মেটাতে,
কখনো রঙ্গে দমকা মেজাজে
কখনো কথায় এ-কাজে সে-কাজে
জুতোয় জামায় সেঁধিয়ে বেরিয়ে
সময়ের গাঁট অনেক পেরিয়ে
ফের মশারিতে যবনিকাপাত
চোখে জল দিয়ে আবার প্রভাত।
বাইরে এখানে জামছায়ায়
ঘটে না কিছুই সারা দুপুর।
এ শুধু সময়বহার সুর।
মনের বাঁধুনি এলিয়ে যায়।

বুদ্ধদেব বসু (জ. ১৯০৮)

১১৭. বন্দীর বন্দনা

(অংশ)

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার-কামনা
রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি;—
তাদের মেটাতে হয় বঞ্চনার দুর্দম বিক্ষোভ।
আছে ক্রূর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মূঢ় ক্লেদলিপ্ত লোভ,
হিরণ্ময় প্রেম-পাত্রে হীন হিংসা-সর্প গুপ্ত আছে।

আনন্দনন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন,
জিঘাংসার কুটিল কুশ্রীতা।
সুন্দরের ধ্যান মোর এরা সব ক্ষণে-ক্ষণে ভেঙে দিয়ে যায়,
কাঁদায় আমারে সদা অপমানে, ব্যথায়, লজ্জায়।
ভুলিয়া থাকিতে চাই ;—ক্ষণতরে ভুলে যাই ডুবে গিয়ে লাবণ্য-উচ্ছ্বাসে-
তবু, হায়, পারিনে ভুলিতে।
নিমেষে-নিমেষে ত্রুটি, পদে-পদে স্খলন-পতন,
আপনারে ভুলে-যাওয়া—সুন্দরের নিত্য-অসম্মান।
বিশ্বস্রষ্টা, তুমি মোরে গড়েছো অক্ষম করি' যদি,
মোরে ক্ষমা করি' তব অপরাধ করিয়ো ক্ষালন।

বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।
না-হয় ডুবিয়া আছি কৃমিঘন পঙ্কের সাগরে,
গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষ্ণায়
শুষ্ক হ'য়ে আছে তবু।
না-হয় রেখেছো বেঁধে ; তবু জেনো, শৃঙ্খলিত ক্ষুদ্র হস্ত মোর
উধাও আগ্রহভরে ঊর্ধ্বনভে উঠিবারে চায়
অসীমের নীলিমারে জড়াইতে ব্যগ্র আলিঙ্গনে।
মোর আঁখি রহে জাগি' নিস্তব্ধ নিশীথে,
আপন আসন পাতে নিদ্রাহীন নক্ষত্রসভায়,
স্বচ্ছ শুভ্র ছায়াপথে মায়ারথে ভ্রমি' ফেরে কভু
আবেশ-বিভ্রমে।
তুমি মোরে দিয়েছো কামনা, অন্ধকার অমারাত্রি-সম,
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্নসুধা মম।
তাই মোর দেহ যবে ভিক্ষুকের মতো ঘুরে মরে
ক্ষুধাজীর্ণ, বিশীর্ণ কঙ্কাল—
সমস্ত অন্তর মম সে-মুহূর্তে গেয়ে ওঠে গান

অনন্তের চিরবার্তা নিয়া ;
সে-কেবল বার-বার অসীমের কানে-কানে একটি গোপন বাণী কহে—
'তবু আমি ভালোবাসি, তবু আমি ভালোবাসি আজি !'
রক্তমাঝে মত্তফেনা, সেথা মীনকেতনের উড়িছে কেতন,
শিরায়-শিরায় শত সরীসৃপ তোলে শিহরন,
লোলুপ লালসা করে অন্যমনে রসনালেহন।
তবু আমি অমৃতাভিলাষী—
অমৃতের অন্বেষণে ভালোবাসি, শুধু ভালোবাসি,
ভালোবাসি—আর-কিছু নয়।
তুমি যারে সৃজিয়াছো, ওগো শিল্পী, সে তো নহি আমি,
সে তোমার দুঃস্বপ্ন দারুণ।
বিশ্বের মাধুর্যরস তিলে-তিলে করিয়া চয়ন
আমারে রচেছি আমি ; —তুমি কোথা ছিলে অচেতন
সে-মহাসৃজন-কালে—তুমি শুধু জানো সেই কথা।

মোর আপনারে আমি নবজন্ম করিয়াছি দান।
নিখিলের স্রষ্টা তুমি, তোমার উদ্দেশে আজি তাই,
মোর এই সৃষ্টিকার্য উৎসৃষ্ট করিনু সন্তর্পণে।
মোর এই নব সৃষ্টি—এ যে মূর্ত বন্দনা তোমার,
অনাদির মিলিত সংগীত।
আমি কবি, এ-সংগীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত উল্লাসে,
এই গর্ব মোর—
তোমার ত্রুটিরে আমি আপন সাধনা দিয়া করেছি শোধন,
এই গর্ব মোর।
লাঞ্ছিত এ-বন্দী তাই বন্ধহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
বন্দনার ছদ্মনামে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ গেলো হানি'
তোমার সকাশে।

১১৮. শেষের রাত্রি

পৃথিবীর শেষ সীমা যেইখানে, চারিদিকে খালি আকাশ ফাঁকা,
আকাশের মুখে ঘুরে-ঘুরে যায় হাজার-হাজার তারার চাকা,
যোজনের পরে হাজার যোজন বিশাল আঁধারে পৃথিবী ঢাকা।
(তোমারি চুলের মতো ঘন কালো অন্ধকার,
তোমারি আঁখির তারকার মতো অন্ধকার ;
তবু চ'লে এসো ; মোর হাতে হাত দাও তোমার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

বিশাল আকাশ বাসনার মতো পৃথিবীর মুখে এসেছে নেমে,
ক্লান্ত শিশুর মতন ঘুমায় ক্লান্ত সময় সহসা থেমে ;
দিগন্ত থেকে দূর দিগন্তে ধূসর পৃথিবী করিছে খাঁ-খাঁ।
(আমারি প্রেমের মতন গহন অন্ধকার,
প্রেমের অসীম বাসনার মতো অন্ধকার ;
তবু চ'লে এসো, মোর হাতে হাত দাও তোমার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

নেমেছে হাজার আঁধার রজনী, তিমির-তোরণে চাঁদের চূড়া,
হাজার চাঁদের চূড়া ভেঙে-ভেঙে হয়েছে ধূসর স্মৃতির গুঁড়া।
চলো চিরকাল জলে যেথা চাঁদ, চির-আঁধারের আড়ালে বাঁকা।
(তোমারি চুলের বন্যার মতো অন্ধকার,
তোমারি চোখের বাসনার মতো অন্ধকার ;
তবু চ'লে এসো, মোর হাতে হাত দাও তোমার,
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

এসেছিলো যত রূপকথা-রাত ঝরেছে হলদে পাতার মতো,
পাতার মতন পীত স্মৃতিগুলি যেন এলোমেলো প্রেতের মতো।
—রাতের আঁধারে সাপের মতন আঁকাবাঁকা কত কুটিল শাখা।
(এসো, চ'লে এসো ; সেখানে সময় সীমানাহীন,
হঠাৎ-ব্যথায় নয় দ্বিখণ্ড রাত্রিদিন ;

সেখানে মোদের প্রেমের সময় সময়হীন,
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

অনেক ধূসর স্মরণের ভারে এখানে জীবন ধূসরতম,
ঢালো উজ্জ্বল বিশাল বন্যা তীব্র তোমার কেশের তমো,
আদিম রাতের বেণীতে জড়ানো মরণের মতো এ-আঁকাবাঁকা।
(ঝড় তুলে দাও, জাগাও হাওয়ার ভরা জোয়ার,
পৃথিবী ছাড়ায়ে, সময় মাড়ায়ে যাবো এবার,
তোমার চুলের ঝড়ের আমরা ঘোড়সওয়ার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

যেখানে জ্বলিছে আঁধার-জোয়ারে জোনাকির মতো তারকা-কণা,
হাজার চাঁদের পরিক্রমণে দিগন্ত ভ'রে উন্মাদনা।
কোটি সূর্যের জ্যোতির নৃত্যে আহত সময় ঝাপটে পাখা।
(কোটি-কোটি মৃত সূর্যের মতো অন্ধকার
তোমার আমার সময়-ছিন্ন বিরহ-ভার ;
এসো, চ'লে এসো ; মোর হাতে হাত দাও তোমার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

তোমার চুলের মনোহীন তমো আকাশে-আকাশে চলেছে উড়ে
আদিম রাতের আঁধার-বেণীতে জড়ানো মরণ-পুঞ্জে ফুঁড়ে,—
সময় ছাড়ায়ে, মরণ মাড়ায়ে—বিদ্যুৎময় দীপ্ত ফাঁকা।
(এসো, চ'লে এসো, যেখানে সময় সীমানাহীন,
সময়-ছিন্ন বিরহে কাঁপে না রাত্রিদিন।
সেখানে মোদের প্রেমের সময় সময়হীন
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

১১৯. চিল্কায় সকাল

কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়
কেমন ক'রে বলি।

কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর,
যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে :

কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে ;
চারদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায় ধোঁয়াটে,
মাঝখানে চিল্কা উঠছে ঝিলকিয়ে।

তুমি কাছে এলে, একটু বসলে, তারপর গেলে ওদিকে,
ইস্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, তা-ই দেখতে।
গাড়ি চ'লে গেলো। —কী ভালো তোমাকে বাসি,
কেমন ক'রে বলি।

আকাশে সূর্যের বন্যা, তাকানো যায় না।
গোরুগুলো একমনে ঘাস ছিঁড়ছে, কী শান্ত!
—তুমি কি কখনো ভেবেছিলে এই হ্রদের ধারে এসে আমরা পাবো
যা এতদিন পাইনি।

রুপোলি জল শুয়ে-শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ
নীলের স্রোতে ঝ'রে পড়ছে তার বুকের উপর
সূর্যের চুম্বনে। —এখানে জ'লে উঠবে অপরূপ ইন্দ্রধনু
তোমার আর আমার রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে
কখনো কি ভেবেছিলে ?

কাল চিল্কায় নৌকোয় যেতে-যেতে আমরা দেখেছিলাম
দুটো প্রজাপতি কত দূর থেকে উড়ে আসছে
জলের উপর দিয়ে। —কী দুঃসাহস! তুমি হেসেছিলে, আর আমার
কী ভালো লেগেছিলো

তোমার সেই উজ্জ্বল অপরূপ মুখ। ছাখো, ছাখো,
কেমন নীল এই আকাশ। —আর তোমার চোখে
কাঁপছে কত আকাশ, কত মৃত্যু, কত নতুন জন্ম—
কেমন ক'রে বলি।

১২০. ব্যাং

বর্ষায় ব্যাঙের ফুর্তি। বৃষ্টি শেষ, আকাশ নির্বাক ;
উচ্চকিত ঐকতানে শোনা গেলো ব্যাঙেদের ডাক।

আদিম উল্লাসে বাজে উন্মুক্ত কণ্ঠের উচ্চ স্বর।
আজ কোনো ভয় নেই—বিচ্ছেদের, ক্ষুধার মৃত্যুর।

ঘাস হ'লো ঘন মেঘ ; স্বচ্ছ জল জ'মে আছে মাঠে।
উদ্ধত আনন্দগানে উৎসবের দ্বিপ্রহর কাটে।

স্পর্শময় বর্ষা এলো ; কী মসৃণ তরুণ কর্দম !
স্ফীতকণ্ঠ, বীতস্কন্ধ—সংগীতের শরীরী সপ্তম।

আহা কী চিক্কণ কান্তি মেঘস্নিগ্ধ হলুদে-সবুজে !
কাচ-স্বচ্ছ ঊর্ধ্বদৃষ্টি চক্ষু যেন ঈশ্বরেরে খোঁজে

ধ্যানমগ্ন ঋষি-সম। বৃষ্টি শেষ, বেলা প'ড়ে আসে ;
গম্ভীর বন্দনাগান বেজে ওঠে স্তম্ভিত আকাশে।

উচ্চকিত উচ্চ স্বর ক্ষীণ হ'লো ; দিন মরে ধুঁকে ;
অন্ধকার শতচ্ছিদ্র একছন্দা তন্দ্রা-আনা ডাকে।

মধ্যরাত্রে রুদ্ধদ্বার আমরা আরামে শয্যাশায়ী,
স্তব্ধ পৃথিবীতে শুধু শোনা যায় একাকী উৎসাহী

একটি অক্লান্ত স্বর ; নিগূঢ় মন্ত্রের শেষ শ্লোক—
নিঃসঙ্গ ব্যাঙের কণ্ঠে উৎসারিত—ক্রোক, ক্রোক, ক্রোক

১২১. রূপান্তর

দিন মোর কর্মের প্রহারে পাংশু,
রাত্রি মোর জলন্ত জাগ্রত স্বপ্নে।
ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর, শুভ্র অগ্নিশিখা,
বস্তুপুঞ্জ বায়ু হোক, চাঁদ হোক নারী,
মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা।
জাগো, হে পবিত্র পদ্ম, জাগো তুমি প্রাণের মৃণালে,
চিরন্তনে মুক্তি দাও ক্ষণিকার অম্লান ক্ষমায়,
ক্ষণিকেরে করো চিরন্তন।
দেহ হোক মন, মন হোক প্রাণ, প্রাণে হোক মৃত্যুর সংগম,
মৃত্যু হোক দেহ, প্রাণ, মন।

১২২. কোনো মৃতার প্রতি

'ভুলিবো না'—এত বড়ো স্পর্ধিত শপথে
জীবন করে না ক্ষমা। তাই মিথ্যা অঙ্গীকার থাক।
তোমার চরম মুক্তি, হে ক্ষণিকা, অকল্পিত পথে
ব্যাপ্ত হোক। তোমার মুখশ্রী-মায়া মিলাক, মিলাক
তৃণে-পত্রে, ঋতুরঙ্গে, জলে-স্থলে, আকাশের নীলে।
শুধু এই কথাটুকু হৃদয়ের নিভৃত আলোতে
জেলে রাখি এই রাত্রে—তুমি ছিলে, তবু তুমি ছিলে।

১২৩. প্রত্যহের ভার

যে-বাণীবিহঙ্গে আমি আনন্দে করেছি অভ্যর্থনা
ছন্দের সুন্দর নীড়ে বার-বার, কখনো ব্যর্থ না
হোক তার বেগচ্যুত পক্ষমুক্ত বায়ুর কম্পন
জীবনের জটিল গ্রন্থিল বৃক্ষে ; যে-ছন্দোবন্ধন
দিয়েছি ভাষারে, তার অন্তত আভাস যেন থাকে
বৎসরের আবর্তনে, অদৃষ্টের ক্রূর বাঁকে-বাঁকে,

কুটিল ক্রান্তিতে; যদি ক্লান্তি আসে, যদি শান্তি যায়,
যদি হৃৎপিণ্ড শুধু হতাশার ডম্বরু বাজায়,
রক্ত শোনে মৃত্যুর মৃদঙ্গ শুধু;—তবুও মনের
চরম চূড়ায় থাক সে-অমর্ত্য অতিথি-ক্ষণের
চিহ্ন, যে-মুহূর্তে বাণীর আত্মারে জেনেছি আপন
সত্তা ব'লে, শুদ্ধ মেনেছি কালেরে, মূঢ় প্রবচন
মরত্বে; যখন মন অনিচ্ছার অবশ্য-বাঁচার
ভুলেছে ভীষণ ভার, ভুলে গেছে প্রত্যহের ভার।

১২৪. অসম্ভবের গান

বৃথাই জপিয়েছি তোমারে, মন,
থামাও অস্থির চ্যাঁচামেচি।
কোথায় অর্জুন! কোথায় কামরূপ!
এক বসন্তেই শূন্য তূণ।

এক বসন্তেই শূন্য তূণ?
তাহ'লে আজো কেন শান্তি নেই?
কেন বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির
পাঞ্চালীরে রাখে পাশায় পণ?

কোনো বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির
জানে না কেন এই পরিশ্রম,
জানে না সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাখা
হঠাৎ কাঁপে কোন আকাঙ্ক্ষায়।

হঠাৎ কাঁপি কোন আকাঙ্ক্ষায়—
বৃথাই জপালাম তোমারে, মন—
উন্মাদিনী পাশা বরং ভালো,
আজো কি চিত্রাঙ্গদার আশা?

বরং প্রোজ্জ্বল জুয়োর চোখে
ত্থাখো-না ডুব দিয়ে কোথায় তল,
কিংবা মদিরার উদার বুকে
পাবে তো অন্তত অন্ধকার।

এখানে কিছু নেই, অন্ধকার,
শূন্য তূণ এক বসন্তেই,
এ-বনে কেন তবে আবার খোঁজো
অনিশ্চয়তার অসম্ভবে!

অনিশ্চয়তার অন্বেষণে
পাঞ্চালীরে পেয়েছিলে সেবার,
সে আজ এত দূর বিখ্যাত যে
স্বয়ং কৃষ্ণের সে-ই মধুর।

ফসল অন্যের, তোমার শুধু
অন্য কোনো দূর অরণ্যের
পন্থহীনতায় স্বপ্নে কেঁপে ওঠা
কোন অসম্ভব আকাঙ্ক্ষায়।

স্বপ্নে ওঠে রোল—কোথায় কামরূপ
কাঁপছে চিত্রাঙ্গদার ঠোঁটে!
হে বীর, ভাঙো ভুল! ব্রহ্মচারী তুমি?
—আবার বসন্তের হুলুস্থূল।

আবার বসন্তের হুলুস্থূল।
ব্রহ্মচারী তুমি, সব্যসাচী!
থামে না চ্যাঁচামেচি! যদি অসম্ভব,
তবে এ-তৃষ্ণার কোথায় মূল?

১২৫. বৃষ্টির দিন

বৃষ্টি এলো, আবার বৃষ্টি! বৈশাখের রূপসী বৃষ্টি নয়, শ্রাবণের আদরে ভরা স্পর্শ নেই, হিম বৃষ্টি, কালো বৃষ্টি, হেমন্তের শীত-নামানো বৃষ্টি।

আ, এই ভালো, এই আমার ভালো লাগে! আশ্বিনের উজ্জ্বল দিনগুলি তাদের হীরের দাঁত দেখিয়ে ব'লে গেছে আমাকে, 'ওরে প্রক্ষিপ্ত মানবক, বিশ্বের অপলাপ, চেয়ে ছাখ আমাদের দিকে—কী সুন্দর আমরা, কী নির্মম, উদাসীন!' তাদের আলোর ধারে ছিঁড়ে গেছি আমি, তাদের ব্যঙ্গের ভারে অবসন্ন।

সান্ত্বনা নিয়ে এলো এই দিন, এই নুয়ে-পড়া বুজে-আসা, নিরবয়ব দিন। ঘণ্টা মুছে গেছে, সময়ের কামড় আজ আর সইতে হবে না আমাকে—কিছুক্ষণ, অন্তত কিছুক্ষণ ছুটি! সকাল মিশে যাবে দুপুরে, দুপুর মিলিয়ে যাবে বিকেলে—চিহ্ন নেই, গয়না নেই, অস্ত্র নেই—একটানা, একাকার, ধূসর।

আজ আকাশ ভ'রে মেঘ ছড়িয়ে পড়েছে আমারই আত্মার কালিমার মতো, আর এই রূঢ় বৃষ্টির তলায় কলকাতা প'ড়ে আছে যেন কামুক স্বামীর ভারপিষ্ট কোনো নির্বোধ নিঃসাড় ক্লান্ত সহিষ্ণু প্রৌঢ় রমণী।

আমি ব'সে আছি জানলায়; অন্ধকার মেঘের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে অনন্তকালের মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছি আমার মনস্তাপ—, তিক্ত স্মৃতি, দুরন্ত অনুশোচনা, আমার নিঃশব্দ, নিঃসঙ্গ চীৎকার।

এদিকে মানুষের সংসারে বেলা বাড়ে; কেউ দোকান খুলে বসে, কেউ ফেরে বাজার থেকে, আর একে-একে ট্র্যামের স্টপে লোকেরা এসে দাঁড়ায়—ছাতা নিয়ে, বর্ষাতি নিয়ে, বেঁচে থাকার গম্ভীর প্রতিজ্ঞা নিয়ে, ভুলে থাকার উদার আশ্বাসে মজ্জমান।

কী ভুলতে চায়? বেঁচে আছে, তা-ই ভুলতে চায়।

শুনছো না বৃষ্টির শব্দে আকাশ ভ'রে ঘোষণা উঠছে—'পালাও! আপিশে, ফ্যাক্টরিতে, ফটকাবাজারে, রাজনীতির উত্তেজনায়—যেখানে হয়, পালাও। আর যখন সন্ধের পর আর-কিছুই থাকবে না, তখন মদ, তখন জুয়ো, তখন পরিজীর্ণ পরিশ্রমী আলিঙ্গন। যেখানে হোক, যেমন ক'রে হোক—পালাও, দুর্ভাগা জীব, লুকিয়ে রাখো তোমার চেতনার অভিসম্পাত, ডুবিয়ে দাও দিনের পর দিনের এই আবর্তন—এই হত্যাকারী আবর্তন! কেননা মৃত্যু দুঃখের নয়, তুমি যে মরছো সেটা জানতে পাওয়াই যন্ত্রণা।

১২৬. শীতরাত্রির প্রার্থনা

এসো, ভুলে যাও তোমার সব ভাবনা, তোমার টাকার ভাবনা, স্বাস্থ্যের ভাবনা,
এর পর কী হবে, এর পর,
ফেলে দাও ভবিষ্যতের ভয়, আর অতীতের জন্য মনস্তাপ।
আজ পৃথিবী মুছে গেছে, তোমার সব অভ্যস্ত নির্ভর
ভাঙলো একে-একে ; —রইলো হিম নিঃসঙ্গতা, আর অন্ধকার নিস্তাপ
রাত্রি ; —এসো প্রস্তুত হও।

বাইরে বরফের রাত্রি। ডাইনি-হাওয়ার কনকনে চাবুক
গালের মাংস ছিঁড়ে নেয়, চাঁদটাকে কাগজের মতো টুকরো ক'রে
ছিটিয়ে দেয় কুয়াশার মধ্যে, উপড়ে আনে আকাশ, হিংস্রুক
হাতে ছড়িয়ে দেয় হিম ; শাদা, নরম, নাচের মতো অক্ষরে
পৃথিবীতে মৃত্যুর ছবি এঁকে যায়।

তাহ'লে ডুবলো তোমার পৃথিবী, হারিয়ে গেলো চিরদিনের অভিজ্ঞান ;
ফুল নেই, পাখি ডাকে না, নাম ধ'রে ভরা গলায় ডাকে না কেউ ;
অচেনা দেশ, অস্থায়ী ঘর, শূন্য ঘরে নিঃসম্বল প্রাণ,
আর বাইরে উত্তরের শীত, অন্ধকার, মেরু-হাওয়ার ঢেউয়ের পর ঢেউ।
এই তো সময় ; —সংহত হও।

সংহত হও, নিবিড় হও ; অতীত এখনো ফুরিয়ে যায়নি, ভুলো না,
যে-অতীত অপেক্ষা ক'রে আছে তোমার জন্য, তারই নাম ভবিষ্যৎ ;
যাবে, হবে, ফিরে পাবে। মুহূর্তের পর মুহূর্তের ছলনা
কেবল চায় বেঁধে রাখতে, লুকিয়ে রাখতে। কিন্তু তোমার পথ
চ'লে গেছে অনেক দূরে, দিগন্তে।

সেই প্রথম দিনে কে হাত রেখেছিলো তোমার হাতে, আজও তো
মনে পড়ে তোমার,

যাতে মনে পড়ে, ভুলতে না পারো, তাই অনেক ভুলতে হবে তোমাকে,
যাতে পথ চলতে ভয় না পাও, ফেলে দিতে হবে অনেক জঞ্জাল,
সাবধানের ভার,
হ'তে হবে রিক্ত, হারাতে হবে যা-কিছু তোমার চেনা, যাতে পথের বাঁকে-বাঁকে
পুরোনোকে চিনতে পারো, নতুন ক'রে।

এসো, আস্তে পা ফ্যালো, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসো তোমার শূন্য ঘরে ;—
তুমি ভ'রে তুলবে, তাই শূন্যতা। তুমি আনবে উষ্ণতা, তাই শীত।
এসো, ভুলে যাও তোমার টাকার ভাবনা, বাঁচার ভাবনা, হাজার ভাবনা—
আর এর পরে
তোমার দিকে এগিয়ে আসবে ভবিষ্যৎ, পিছন থেকে ধ'রে ফেলবে অতীত।
এসো, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও আজ রাত্রে।

তা-ই চাও তুমি, তারই জন্য তোমার বুভুক্ষা ; এই মৃত্যুর হাতেই
মুহূর্তের পর মুহূর্তের ছলনা হবে ছিন্ন ;
যেমন তোমার চোখের সামনে পৃথিবী ম'রে গেলো আজ—ফুল নেই,
সব সবুজ নিবে গেছে, চারদিকে শুধু কঠিন শাদা স্তব্ধতার চিহ্ন—
তেমনি তোমাকে ডুবতে হবে, তোমাকেও।

ডুবতে হবে মৃত্যুর তিমিরে, নয়তো কেমন ক'রে বেঁচে উঠবে আবার ?
লুপ্ত হ'তে হবে পাতালে, নয়তো কেমন ক'রে ফিরে আসবে আলোয় ?
তুমি কি জানো না, বার-বার মরতে হয় মানুষকে, বার-বার,
দুলতে হয় মৃত্যু আর নবজন্মের বিরামহীন দোলায়
সত্যি যদি বাঁচতে হয় তাকে।

অন্ধকারকেই মৃত্যু নাম দিয়েছি আমরা। বীজ ম'রে যায়,
যখন অদৃশ্য হয় মাটির তলায় সংগোপন গূঢ় গহ্বরে ;
শীত এলে ম'রে যায় পৃথিবী, ঝ'রে যায় পাতা, নেয় বিদায়

ঘাস, ফুল, ঘাস-ফড়িং ; নেকড়ে আসে বেরিয়ে ; কালো, কালো
নিষ্ঠুর কবরে
হারিয়ে যায় প্রাণ—ধবধবে তুষারের তলায়।

তেমনি তুমি ; —তোমারও রোদ ম'রে গেলো, ঘন হ'য়ে ঘিরলো কুয়াশা,
তোমার আলোর পৃথিবী ছেড়ে তুমি নেমে এলে পাতালে,
তোমার রঙিন সাজ ছিঁড়ে গেলো, মুছে গেলো নাম, ভুলে গেলে
তোমার ভাষা,
যত চোখ তোমাকে চিনেছিলো একদিন, সেই সব উৎসবের মতো
চোখের আড়ালে
তুমি মিলিয়ে গেলে—অন্ধকার থেকে অন্ধকারে।

কিন্তু মাটির বুক চিরে লুপ্ত বীজ ফিরে আসে একদিন,
আবার দেখা দেয়, অন্য নামে, নতুন জন্মে, রাশি রাশি ফসলের ঐশ্বর্যে ;
আর এই শীত—তুমি তো জানো—প্রত্যেক ফোঁটা বরফের সঙ্গে
তারও শুধু জ'মে উঠছে ঋণ,
সব শোধ ক'রে দিতে হবে ; প্রচ্ছন্ন প্রাণ অবিচল ধৈর্যে
জেগে আছে দীর্ঘ, দীর্ঘ রাত্রি।

শুধু জেগে আছে তা-ই নয়, কাজ ক'রে যাচ্ছে গোপনে-গোপনে,
সৃষ্টি ক'রে যাচ্ছে মৃত্যুর বুকে নতুন জন্ম, কবর ফেটে অবুঝ
অদ্ভুত উৎসারণ, পাথর ভেঙে স্রোত, বরফের নিথর আস্তরণে
স্পন্দন—যখন ঘোমটা ছিঁড়ে উঁকি দেবে ক্ষীণ, প্রবল, উজ্জ্বল, আশ্চর্য সবুজ
বসন্তের প্রথম চুম্বনে।

আর তাই এই মৃত্যু তোমার প্রতীক্ষা—তোমাকে তার যোগ্য হ'তে হবে,
ভুলতে হবে সাবধানের দীনতা, হাজার ভাবনার জঞ্জাল ;
সন্দেহ কোরো না, প্রতিবাদ কোরো না ; নিহিত হও এই কঠিন হিম ধবধবে

আস্তরণের অন্তঃপুরে, বীজের মতো—যেখানে অপেক্ষা ক'রে আছে
তোমার চিরকাল।
উৎসর্জন করো, সমর্পণ করো নিজেকে।

নিবিড় হ'লো রাত্রি, পাৎলা চাঁদ ছিঁড়ে গেলো, নেকড়ের মতো অন্ধকার,
দলে-দলে ডাইনি বেরোলো হাওয়ায়, আততায়ীর ছুরির মতো শীত।
এরই মধ্যে তোমার যজ্ঞ; উৎসর্গ হবে প্রাণ, আগুন জ্বালবে আত্মার,
ভস্ম হবে যাকে ভেবেছো তোমার ভবিষ্যৎ, আর যাকে জেনেছো তোমার অতীত।
পবিত্র হও, প্রতীক্ষা করো।

ঐ শোনো, ঘণ্টা বাজে গির্জেতে; এদের উৎসবের ক্ষণ আসন্ন।
ঈশ্বরের একজাত, একমাত্র পুত্রের জন্মের স্মরণে ;—
কিন্তু তুমি—তোমার শরীর ভিন্ন মাটিতে তৈরি, অন্য
গান বাজে তোমার রক্তে, অন্য এক আশ্বাসের উচ্চারণে
ধ্বনিত তোমার ইতিহাসের আকাশ।

তুমি জেনেছো, মানুষমাত্রেই অমৃতের পুত্র—শুধু একজন নয়, প্রত্যেকে,
তুমি বলেছো, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে,
তুমি শুনেছো, জন্মের পর জন্মান্তর আবর্তের মতো এঁকে-বেঁকে
অমৃতের দিকে নিয়ে যায়; —আর এই জীবন, সেও তার সময়ের
সীমায়, মাংসের গণ্ডিতে
বন্দী হ'য়ে থাকবে না।

তাই তো জানো তুমি—বার-বার মরতে হয় মানুষকে, নতুন ক'রে
জন্ম নেবার জন্য,
শুধু জন্ম-জন্মান্তর নয়, একই জন্মে তার এই মৃত্যু আর পুনরুত্থান,
শুধু একজনের নয়, সকল মানুষের—হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার অরণ্য

লুকিয়ে রেখেছে চিরকাল এই বুভুক্ষা—তারই জন্য সব কান্না,
সব কান্না-ভরা গান,
বুকে বুক রেখে তৃপ্তিহীন প্রেমিক।

তৃপ্তিহীন বিরহে তুমি জলছো—জলতে দাও, পুড়ে যাক যা-কিছু
তোমার পুরোনো,
ডিমের খোলশের মতো ফেটে যাক তোমার পৃথিবী, বেরিয়ে আসুক
অন্য এক জগৎ,
এই পাতাল বেয়ে নেমে যাও আরো, আরো অন্ধকারে; যখন সব
হারাবে, কোনো
চিহ্ন আর থাকবে না, তখনই তোমাকে ধ'রে ফেলবে অতীত, এগিয়ে আসবে
তোমার দিকে ভবিষ্যৎ—
সব নতুন—নতুন হ'য়ে।

সময় হ'লো, বাইরে অনাকার অন্ধকার, প্রেতের চীৎকারের মতো হাওয়া;
অচেনা দেশ, অস্থায়ী ঘর, শূন্য ঘরে নিঃসম্বল প্রাণ;
আজ আর কিছু নেই তোমার—শুধু একফোঁটা রক্তে-লীন সংগোপন
ঝাপসা পথ-চাওয়া
এই ব্যাপ্ত কুয়াশার মধ্যে ক্ষীণ, ক্ষণিক, লুকিয়ে-থাকা তারার মতো
কম্পমান।
প্রস্তুত হও, প্রতীক্ষা করো তোমার মৃত্যুর জন্য।

যে-মৃত্যুকে ভেদ ক'রে লুপ্ত বীজ ফিরে আসে নির্ভুল,
রাশি-রাশি শস্যের উৎসাহে, ফসলের আশ্চর্য সফলতায়,
যে-মৃত্যুকে দীর্ণ ক'রে বরফের কবর ফেটে ফুল
জ'লে ওঠে সবুজের উল্লাসে, বসন্তের অমর ক্ষমতায়—
সেই মৃত্যুর—নবজন্মের প্রতীক্ষা করো।

মৃত্যুর নাম অন্ধকার; কিন্তু মাতৃগর্ভ—তাও অন্ধকার, ভুলো না,
তাই কাল অবগুণ্ঠিত, যা হ'য়ে উঠছে তা-ই প্রচ্ছন্ন;

এসো, শান্ত হও ; এই হিম রাত্রে, যখন বাইরে-ভিতরে কোথাও
আলো নেই,
তোমার শূন্যতার অজ্ঞাত গহ্বর থেকে নবজন্মের জন্য
প্রার্থনা করো, প্রতীক্ষা করো, প্রস্তুত হও।

১২৭. দায়িত্বের ভার

কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নয় আর।
লেখা, পড়া, প্রুফ পড়া, চিঠি লেখা, কথোপকথন,
যা-কিছু ভুলিয়ে রাখে, আপাতত প্রত্যহের ভার—
সব যেন, বৃহদরণ্যের মতো তর্কপরায়ণ
হ'য়ে আছে বিকল্পকুটিল এক চতুর পাহাড়।
সেই যুদ্ধে বার-বার হেরে গিয়ে, ম'রে গিয়ে, মন
যখন বলেছে ; শুধু দেহ নিয়ে বেঁচে থাকা তার
সবচেয়ে নির্বাচিত, প্রার্থনীয়, কেননা তা ছাড়া আর
কিছু নেই শান্ত, স্নিগ্ধ, অবিচল প্রীতিপরায়ণ—
আমি তাকে তখন বিশ্বস্ত ভেবে, কোনো-এক দীপ্ত প্রেমিকার
আলিঙ্গনে সত্তার সারাৎসার ক'রে সমর্পণ—
দেখেছি দাঁড়িয়ে দূরে, যদিও সে উদার উদ্ধার
লুপ্ত ক'রে দিলো ভাবা, লেখা, পড়া, কথোপকথন,
তবু প্রেম, প্রেমিকেরে ঈর্ষা ক'রে, নিয়ে এলো ক্রূর বরপণ—
দুরূহ, নূতনতর, ক্ষমাহীন দায়িত্বের ভার।
কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নেই আর।

১২৮. রাত তিনটের সনেট

(১)

শুধু তা-ই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত। গভীর সন্ধ্যায়
নরম, আচ্ছন্ন আলো ; হলদে-ম্লান বইয়ের পাতায়
লুকোনো নক্ষত্র ঘিরে আকাশের মতো অন্ধকার ;
অথবা অন্তর চিঠি, মধ্যরাতে লাজুক তন্দ্রায়

দূরের বন্ধুকে লেখা। যীশু কি পরোপকারী
ছিলেন, তোমরা ভাবো ? না কি বুদ্ধ কোনো সমিতির
মাননীয়, বাচাল, পরিশ্রমী, অশীতির
মোহগ্রস্ত সভাপতি ? উদ্ধারের স্বত্বাধিকারী

ব্যতিব্যস্ত পাণ্ডাদের জগঝম্প, চামর, পাহারা
এড়িয়ে আছেন তাঁরা উদাসীন, শান্ত ছন্নছাড়া।
তাই বলি, জগতেরে ছেড়ে দাও, যাক সে যেখানে যাবে ;

হও ক্ষীণ, অলক্ষ্য, দুর্গম আর পুলকে বধির।
যে-সব খবর নিয়ে সেবকেরা উৎসাহে অধীর,
আধ ঘণ্টা নারীর আলস্যে তার ঢের বেশি পাবে।

১২৯. স্মৃতির প্রতি

(৩)

আমাদের পরিবর্তনের
অর্থ · এই দেহ ম্রিয়মাণ ;
দ্যুতিময় জন্তুর উত্থান
তাও শুধু পিতৃহননের

নান্দীপাঠে ফাল্গুন ফুরায়।
কৈশোরের মঞ্জুল মুখোশ
ঢেকে রাখে জরার আক্রোশ ;
প্রগতির দৃপ্ত পাহারায়

অবিরাম চলে অধঃপাত।
বাঁচে শুধু, যা তোমার হাত
চিরকাল মূর্ছার কন্দরে

রেখে দিয়ে, করে উন্মোচন—
রূপান্তর থেকে রূপান্তরে—
পৃথিবীর প্রথম যৌবন।

১৩০. স্টিল্ লাইফ

সোনালি আপেল, তুমি কেন আছো? চুমো-খাওয়া হাসির কৌটোয়
দাঁতের আভায় জলা লাল ঠোঁটে বাতাস রাঙাবে?
ঠাণ্ডা, আঁটো, কঠিন কোনারকের বৈকুণ্ঠ জাগাবে
অপ্সরীর স্তনে ভরা অন্ধকার হাতের মুঠোয়?

এত, তবু তোমার আরম্ভ মাত্র। হেমন্তের যেন অন্ত নেই।
গন্ধ, রস, স্নিগ্ধতা জড়িয়ে থাকে এমনকি উন্মুখ নিচোলে।
তৃপ্তির পরেও দেখি আরো বাকি; এবং ফুরোলে
থামে না পুলক, পুষ্টি, উপকার। কিন্তু, শুধু এই?

তা-ই ভেবে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু মাঝে-মাঝে
আসে ভারি-চোখের দু-একজন কামাতুর, যারা
থালা, ডালা, কাননের ছদ্মবেশ সব ভাঁজে-ভাঁজে

ছিঁড়ে ফেলে, নিজেরা তোমার মধ্যে অদ্ভুত আলোতে
হ'য়ে ওঠে আকাশ, অরণ্য আর আকাশের তারা—
যা দেখে, হঠাৎ কেঁপে, আমাদেরও ইচ্ছে করে অন্য কিছু হ'তে।

১৩১. ঋতুর উত্তরে

শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষার দিন, আমি এতদিনে
তোমাদের বিরাট খামখেয়াল জয় ক'রে, হৃদয়সন্ধ্যায়
নিয়েছি সুযোগমুক্ত, হৃতভাগ্য শূন্যতারে চিনে—

আমি, মৃত, নিশ্চিত, ভবিষ্যময়, প্রশ্নের অতীত।
পউষে ফাল্গুনে গাঁথা কান্না-হাসি-দোলানো অন্যায়
আমাকে বেঁধে না আর ; বড়ো জোর বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মার সংবিৎ

এঁকে যায় সামান্য গণিতচিহ্নে পঞ্জিকার পালা—
যেন এক পুরোনো প্রাসাদে শুধু অনুপস্থিতি
দেখায় আঙুল তুলে ঘরে-ঘরে মরচে-পড়া তালা।

আমার হৃদয় আজ চিরন্তন হেমন্তে বিলীন ;
কুয়াশা, চাঁদের প্রেত, রশ্মি-জ্বলা পশ্চিমের স্মৃতি—
সব মিশে অন্ধকারে ভ'রে দেয় আলোর পুলিন :

শুধু স্বপ্নে শুনে-শুনে একতাল, ঋতুহীন সমুদ্রের স্বর—
নিঃসঙ্গতা ! জেনেছি তোমারই নাম শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বৎসর।

নিশিকান্ত

(জ. ১৯০৯)

১৩২. পণ্ডিচেরির ঈশানকোণের প্রান্তর

কোন
সংগোপন
থেকে এলো, এই উজ্জ্বল
শ্যামল
বিন্দুর শিখা !
এই পাষাণখণ্ড-কণ্টকিত
শুষ্ক রুধির-সঞ্চিত
প্রাণহীন রক্তবর্ণ মৃত্তিকা
কার স্পর্শে পেয়েছে প্রাণ ?
অমৃত-সিঞ্চিত বন-মঞ্জরীর অবদান

কোন অদৃশ্য সৌন্দর্যের উৎস থেকে উৎসারিত—
এই গরল-কুণ্ডলিত
ভুজঙ্গ-ভূমির অঙ্গে-অঙ্গে
প্রস্ফুটিত মাধুরীর তরঙ্গে!

যোজনের পর
যোজন-বিস্তৃত প্রান্তর;
আজ সকাল বেলা
এসেছি এখানে। দূরে-দূরে দেখা যায় রুক্ষ মাটির স্তূপের মেলা,
তারি উপর দণ্ডের মতো দাঁড়ানো জমাটবাঁধা পাথর-কুচির চাঙড়া,
যেন ক্ষিপ্ত মুণ্ড
নাসা খড়্গাধারী গণ্ডার, যেন উদ্যতশুণ্ড
মদমত্ত মাতঙ্গের মতো।

রাক্ষসী মেদিনী অবিরত
বৎসরে-বৎসরে
নিজেই নিজেকে গ্রাস ক'রে-ক'রে
সৃষ্টি করেছে এই আরক্তদশন
বুভুক্ষার গহ্বর-প্রাঙ্গণ।
বক্ষে তার
বালু-কঙ্করের বঙ্কিত পঞ্জার
কঙ্কাল।
তারি একপাশে ভস্ম-ভাল
শ্মশান; প'ড়ে আছে দগ্ধশেষ চিতার
নিরুত্তাপ পাংশু অঙ্গার,
জীর্ণ মলিন বিক্ষিপ্ত কন্থার
রাশি, ভগ্ন কলসের কানা,
নর-কপালের করোটি, শকুনির নখরচিহ্ন, শবলুব্ধ সংগ্রামে
পরাজিত মৃত বায়সের বিচ্ছিন্ন ডানা;

ব'সে আছে অপরাজেয়

লোলুপ দৃষ্টির অধিকারী কৃষ্ণকায় সারমেয়।

তবু সেখানে সর্বজয়ী জীবনের

বিকাশের

লিখা

এনেছে দুর্লভ তৃণমঞ্জরী, বিন্দু-বিন্দু সবুজ গুল্ম-শিখা!

আর

দুর্দম দুর্বার

মর্ত্য-বিদ্রোহী তাল-বিটপীর বৃন্দ; তাদের

অটল স্বরূপের

অভিযান তুলেছে উর্ধ্বের

উদ্দেশে, যেন সহস্রশির

বাসুকির

শত-শত ফণা রসাতল ভেদ ক'রে

উঠেছে তুলে অনন্ত অম্বরে,

তারা

পান করে যেন সেই সুনীল সুধার অক্ষর-ধারা;

যেন কোন খেয়ালি চিত্রকর, আষাঢ়ের

ঘনীভূত মেঘের

রঙের পাত্র শূন্য ক'রে নিয়ে

ধূমকেতুর পুচ্ছের মতো বিশাল তুলি দিয়ে

ঐ অভ্রংলিহ রেখার সারি করেছে অঙ্কিত,

তারি চূড়ায়

শাখায় শাখায়

করেছে তরঙ্গিত

হরিদ্বর্ণ রশ্মিবিকীর্ণ তীক্ষ্ণ-ধার

পাতার

ত্রিকোণ মণ্ডলিকাছন্দের নীহারিকাপুঞ্জ ; সেখানে বিষাণ
বাজায় বাতাস, দোলে বিজয়নিশান ;

তাদের
সর্ব অঙ্গে পুরু ইস্পাতের
চক্রাকার আবর্তনের
কালজয়ী আবরণ ;
নলকূপের মতো তাদের মূল—
এই উষরপিণ্ড পৃথুল
পৃথিবীর জঠরের অতল তলে
পলে-পলে
করেছে সঞ্চিত
মর্ত্য শ্মশান-মন্থিত
অমৃত।

হে সম্রাট-শিল্পী, সুন্দর ! কোন অচিন্ত্য লোকের
রহস্যের
বেদিকায় ব'সে আছো তুমি ?
এই মরু-বাস্তব ভূমি
তোমার
নিমগ্ন কল্পনার
নির্লিপ্ত আনন্দের
পরম-বস্তু-রসের
রঞ্জনে রঞ্জিত হয়।
জ্যোতির্ময় !
দাও দীক্ষা, অপূর্ব রূপান্তরসাধনের মন্ত্র দাও আমায় ;
যে-মন্ত্রের শক্তিতে সত্তায়
বিলুপ্ত হবে মেদিনীর
মাতঙ্গ প্রকৃতির

মদমত্ত অভিযান, রাক্ষসী কামনার
বুভুক্ষার
বিক্ষুব্ধ আসক্তি ;
জীবনের অভিব্যক্তি
হবে মূর্ত, ঐ বিরাট তাল-বিটপীর নীলাম্বরচুম্বিত
আত্মার মতো, বর্তিকা
জ্বলবে অন্তরে
ঐ ওজস্বান তৃণশিখার অঙ্কুরে।
দাও তোমার বর্ণমন্দাকিনীর লাবণ্যধারা-নির্ঝরিত তুলিকা,
স্পর্শে যার
দীর্ণ ক'রে আমার
কঠিন প্রাণখণ্ডের শিলা
মুঞ্জরিত হবে তোমার
অমর্ত্য মালঞ্চের
মাধুর্য মন্দারের
সৌন্দর্য-লীলা।

১৩৩. মহামায়া

সম্মুখে প্রাচীরে ফাটলের বুকে আঁকা
সারমেয়মুখী ডাকিনী কাহারে ডাকে !
তারি দক্ষিণে দোলে অশথ শাখা
পাংশুল পাখি সেথায় বসিয়া থাকে।
কৃষ্ণ মেঘের মহিষমুণ্ডটিরে
কে বসালো নীল আকাশের বুক চিরে !
দিগন্তরেখা দ্বিখণ্ড করি
দাঁড়ায়েছে তাল-তরু ;
সাড়ে-তিন গজ ধূসর ভূমিতে
বিশাল সাহারা মরু।

নেভে আর জ্বলে জোনাকি-যোনির শিখা,
মসীর সাগরে বহ্নির বুদ্বুদ !
অট্ট হাসিছে রাতের অট্টালিকা,
দ্বারে বাতায়নে বর্তিকাবিদ্যুৎ।
শাদা আগুনের তরণীতে চাঁদ চলে,
তারার রুপালি তীরের ফলক ঝলে ;
চাহে মার্জার চক্ষু মেলিয়া
মূষিক-বিবর পাশে,
দৃষ্টিতে তার তিমিরদীর্ণ
সূর্য-হীরক হাসে।

ওঠে গম্ভীর অম্বুধিগর্জন,
ভাসে অসংখ্য তরঙ্গ-সংঘাত ;
খর্জুরশাখে ঝিল্লির প্রস্বন ;
সহসা বিধবা করিলো আর্তনাদ !
নবজাত শিশু হেসে ওঠে খলখল ;
শ্মশানযাত্রী করে ওই কোলাহল ;
লৌহদশনে হুংকার করে
দানব যন্ত্রযান ;
বাতাসে ভরিলো শেফালি-ঝরার
মৃদু মঞ্জুল তান।

সহসা উর্ধ্বে উঠিলো রংমশাল
অভ্র ভেদিলো মুহূর্তে গতি তার ;
উল্কার শিখা তারি সাথে দিলো তাল
উৎসের গতি লভিলো সে অধিকার ;
বৃষভ-যানের চাকার কেন্দ্র পাশে
তারি আবর্ত ঘুরিয়া-ঘুরিয়া আসে,

সে-গতির বেগে বীজের বক্ষ
অঙ্কুরি' টুটিয়াছে ;
হিমাদ্রি-শির তাহারি মন্ত্র
জপি' নভে উঠিয়াছে।

সকল মূর্তি মূর্তিলো কার মাঝে
সারমেয়মুখী ডাকিনী কাহার মায়া !
কার বহ্নিতে সবার বহ্নি বাজে,
শশাঙ্কে কার শুভ্র শিখার কায়া !
কোন সে নীরব ধাত্রীর কোলে
জলধি ও শিশু তরঙ্গ তোলে ;
সৃষ্টির গতি-উৎস কে আনে—
কে তারে ধরিয়া রাখে।
অসংখ্য নামে নামখানি কার
ওঙ্কার-সম থাকে !

বিষ্ণু দে (জ. ১৯০৯

১৩৪. টপ্পা-ঠুংরি

তোমার পোস্টকার্ড এলো,
যেন ছড়টানা স্রোতে
পিৎসিকাটোর আকস্মিক ঘূর্ণি,
রেডিওর ঐকতানে বিস্মিত আবেগ।
দিন কাটলো
যেন ঝিলুহাবিলম্বিতে।
গানের কলির অলিতে-গলিতে
বাস্ গেলো, ক্লাস গেলো কালের জয়যাত্রায় কেটে।
জাঁদরেল প্রোফেসরের মাথায় নামলো
ব্যঙ্গাতীত ক্ষমার আকাশে প্রথম করুণার আশীর্বাদ।

কাব্যেই হ'লো করুণা ; করুণায় কাব্য
সেই দিন প্রথম।

নামলো সন্ধ্যা,
সূর্যদেব, এখানে নামলো সন্ধ্যা,
কবিতার সন্ধ্যা
পিলু বারোয়াঁর সন্ধ্যা।
একাকার এই ম্লান মায়ায়
জাগরহৃদয়ের গোধূলিলগ্নে
শুধু নীলাভ একটু আলো এলো
তোমার পোস্টকার্ড,
আর এলো তোমার ট্রেনের অস্পষ্ট দূরাগত ডাক।

সূর্যদেব, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ ক'রে চ'লে
যাক।

বাসের এ কী শিংভাঙা গোঁ!
যন্ত্রের এই খামখেয়াল!
এদিকে আর পঁচিশ মিনিট—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।

স্বেচ্ছাতন্ত্র ছেড়ে দ্বৈতাচারী ট্রামই ভালো,
ইচ্ছার দায়িত্বহীনতা ছেড়ে সংস্কারের বাঁধা সড়ক।
বড়োবাজারের উপল-উপকূলে
জনগণের প্রবল স্রোত
উগারিছে ফেনা
আর বিড়ির আর সিগারেটের আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া
আর পানের পিক
আর দীর্ঘশ্বাস,

বড়োবাবুর গঞ্জনায়
বড়োসাহেবের কটা চোখের ব্যঞ্জনায়
দাম্পত্যমিলনের ভ্রান্ত সম্ভাবনায়
অপত্যাধিক্যের অনুশোচনায়
ট্রামের বাসের কারের ফেরিওয়ালার রলরোলে।
এই ক্লাইভ ডালহুসি লায়ন্স্ রেঞ্জের ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের
ক্লান্ত নীরবতায়
তিক্ত গুঞ্জনে
শুধু অস্পষ্ট একটা বিরাট লাগডাঁট আওয়াজ
যেন শিশিরভেজা মাটিতে পাতাঝরার গান
বা যেন একটা বিরাট অতনু দীর্ঘশ্বাস
বড়োবাজারের ক্ষতবিক্ষত কিন্তু অমর আকাশে
তারায়-তারায় কাঁপন লাগে যার মীড়ে-মীড়ে।

নিতে হ'লো ট্যাক্সি।
নতুন ব্রিজে কি ট্রামলাইন পাতবে ওরা?

হে বিরাট নদী!
স্টিমারের বাঁশি
খালাসির গান
সব-পেয়েছির দেশে
ককেনের দেশে
যত-কিছু বই ছিলো সব পড়ার শেষে
ক্লান্ত রক্তের বিবর্ণ আবেশে
স্টিমারের বাঁশি
আর খালাসির গান!

ট্রাফিক থমকে দাঁড়ায়, হোঁচট খায়
বেতালা, বেসুরো, মিলের, কলের চোঙার ধোঁয়ায়

পণ্টুনের ফাঁকে-ফাঁকে শিরশিরে হাওয়ায়
আলোয় ঝিকিমিকি জলস্রোতে।
জলস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান,
আশে আর পাশে, সামনে-পিছনে
সারি-সারি পিঁপড়ের গান,
জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোককে জীবনের বলি,
মানিনি আগে
জীবিকার পথে-পথে এত লোক,
এত লোক গোপনসঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি আগে
পিঁপড়ের সারি
অগণন ভিড়াক্রান্ত হে শহর, হে শহর স্বপ্নভারাতুর!

পাঁচ মিনিট, পাঁচ মিনিট মোটে
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
উদ্দাম উধাও
ট্রেন এলো ব'লে হাওড়ায়।
ওপারে স্টক এক্সচেঞ্জের এপারে রেলওয়ের হাওড়া,
তারি মধ্যে ব'সে আছেন শিবসদাগর
ট্যাক্সির হৃদ্‌স্পন্দে, ট্র্যাফিকের এটাক্‌সিয়ায়।

এলো ট্রেন
মন্থিত ক'রে রক্তের জোয়ার
আমারই একান্ত মগ্নচৈতন্য মন্থিত ক'রে
দেখলুম তোমার ক্লোস্‌-অপ্‌ মুখ জানলায়,
—একটা ঝুলি—
শুনলুম যেন ভোরবেলাকার ভৈরবীতে।

হায়রে! আশার ছলনে ভুলি!
কোথায় তুমি! ট্রেন তো এলো!
কয়লাখনি ধ'সে পড়ুক,
ধর্মঘট নাই বা থামলো,
ট্রেন তো এলো!
তোমার কি অসুখ হ'লো?
তোমার বাবার?
হঠাৎ দেখি লাব্‌সি
বললে, এই যে, কী খবর,
আমার জন্যে এলেন নাকি?
দিদি আসবে সাতুই।
ভেবেছিলুম তন্দ্রালসা সন্ধ্যার গোধূলি-ছায়ায়
ট্যাক্সির নিঃসঙ্গ মায়ায়
ট্রেনের ছন্দে স্পন্দিত তোমার হৃদয়ের গানে
হাতে হাত উষ্ণতায়
করবো সেই চরম প্রকাশ, সেই পরম যবনিকামোচন! হায়রে!
—আমার ফাঁকা লিবিডোকে এখন চালাবো কোন খেয়ালের
বাঁকা খালে?
কোন ধ্রুপদী অবদমনের নিদ্রাহীনতায়?

১৩৫. ক্রেসিডা

স্বপ্ন আমার কবিতা,
অমাবস্যার দেয়ালি,
ধূম্রলোচন নিদ্রাহীন
মাঘ-রজনীর সবিতা।

হৃদয় আমার খেয়ার যাত্রী বৈতরণীর পার।
কাণ্ডারীহীন বালুকাবেলায় দৃষ্টি ঘুরিছে দূরে।
হৃদয় আমার ছাপিয়ে উঠেছে বাতাসের হাহাকার।

দিনগুলি তুমি তুলে নিলে অঞ্চলে।
বালুচরচারী দৃষ্টিতে ঝরে সান্নিধ্যের ধারা।
রাত্রিও চাও? শ্রাবণের ধারাজলে
মুখর হৃদয় তালীবনদীঘি কল্লোলে অবিরাম।

ক্রেসিডা! তোমার থমকানো চোখে চমকায় বরাভয়।
তোমার বাহুতে অনন্ত-স্মৃতি ক্রতুকুতমের শেষ।
তোমাতেই করি মত্ত মরণে জয়।

মহাকাল আজ দক্ষিণ কর প্রসারে আমারই দিকে।
ভীরু দুর্বল মন!
দৈবের হাতে হাত বেঁধে যাওয়া মহাসিন্ধুর ডাকে!
সর্ব-সমর্পণ!

হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল।
দ্যুলোকে ভূলোকে দিশাহারা দেবদেবী।

কাল রজনীতে ঝড় হ'য়ে গেছে রজনীগন্ধা-বনে।

বৈশাখী মেঘ মেদুর হয়েছে সুদূর গগনকোণে।
কুরুক্ষেত্রে উড়েছে হাজার রথচক্রের ধূলি।
স্বপ্ন-গোধূলি ডুবে গেলো খর-রক্তের কোলাহলে।

লাল মেঘে ঠেলে নীল মেঘ, নীলে ধোঁয়া মেঘেদের ভিড়
মেঘে-মেঘে আজ কালো কল্কির দিন হ'লো একাকার।
বিদ্যুৎ নেভে ঈশানবিষাণে, বজ্রও দিশাহারা।
এলোমেলো পাখা ঝাপটি' তবুও ওড়ে কথা ক্রেসিডার।

ভ্রান্তি আমাকে নিয়ে যায় যদি বৈতরণীর পার,
ভবিষ্যহীন আঁধার ক্লান্তি কাকে দেবো উপহার?
তপ্ত মরুর জনহীনতায় কোথায় সে-প্যাণ্ডার?

স্বসমুখ সে কোন দেবতার স্বিরাচারী সম্ভাষে
অমরাবতীর সমাহারী নারী হেলেনের বালালোল!
আমারই শেফালি জেবলী কেবল ঝরে জবাসংকাশে!

সূর্যালোকের ধারায় লেগেছে জীবনের অঙ্কুর।
আত্মদানের উৎসেই জানি উজ্জীবনের আশা।
অসূর্যলোকে বন্দী, কুমারী, তোমাতেই খুঁজি ভাষা।

সময়ের থলি শতচ্ছিদ্র, বিস্মৃতিকীট কাটে।
প্রাণোপাসনার পূজারি তাই তো তোমার শরণ মাগি।
প্রাণহন্তারা রলরোলে চলে ট্রয়ের মাঠে ও বাটে।

উষসী-আকাশ ধূসর করেছে মরণের আনাগোনা।
হেলেনের বুকে শবসাধনার বিশ্রাম আর নেই।
আমার হৃদয়-ঘটাকাশে শুধু জীবনের আরাধনা।

ট্রয়ের প্রাচীর ভঙ্গুর কেন? কোন হেলেনের
অমর রূপের প্রখর আবেগে বিপুল বিশ্ব হারালো দিশা?
লোকোত্তর এ-রূপসী বা কেন? লোকায়তিক এ-মরণতৃষা?

জানি, জানি, এই অলাতচক্রে চক্রমণ।
সোৎপ্রাসপাশে বলি নাকো তাই কথা।
ক্রেসিডা! আমার প্রচণ্ড আকুলতা—
জিজীবিষু প্রজাপতির বিভ্রমণ।

সোনালি হাসির ঝরনা তোমার ওষ্ঠাধরে।
প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে ছড়ায় চপল মায়া।
মুখর সে-গান ভেঙে গেলো। আজ স্তব্ধ তমাল।
হালকা হাসির জীবনে কি এলো ফসলের কাল?

এই তবে ভোরবেলা।
হে ভূমিশায়িনী শিউলি! আর কি
কোন সান্ত্বনা নেই?

রজনীগন্ধা দিয়েছিলে সেই রাতে,
আজো তো সে ফোটে দেখি—
মদির অধীর রাতের তন্বী ফুল—
রজনীগন্ধা, বিরাগ জানে না সে কি?

দুঃস্বপ্নেও প্রেম করেনি এ-আশা।
শত্রুশিবিরে কুমারীর নত চোখে, মুখে সারা শরীরে নগ্ন ভাষা!
হে গ্রীক নাগর! ট্রয়কে হারালে আজই!

কালের বিরাট অট্টহাসির ছায়া
ঢেকে দিলো ঢেকে তোমারও মরণ-মায়া—
হে মাতরিশ্বা, মহাশূন্যের সুখে
তুড়ি দিয়ে যাই তোমারও প্রবল মুখে।

তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ ক'রে দেবে?
উদ্বায়ু আজো হয়নি আমার মন।
লোকায়ত মোর স্বেচ্ছাবর্মে লেগে
বর্শা তোমার হ'য়ে গেলো খানখান।

বুদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধমস্নাবির!
জড় কবন্ধ অন্ধ কর্মে ফুৎকারে করি নর্মাচার।
প্রাক্তন-পাশ্চাত্য মাগি না, মন তুষার।

পাহাড়ের নীল একাকার হ'লো ধূসর মেঘের স্রোতে
পাঁচ পাহাড়ের নীল।

বাতাসেরা সব বাসায় পালালো মেঘের মুষ্টি হ'তে
স্তব্ধ নিথর সাত-সায়রের বিল।

শিবা ও শকুনি পলাতক, জানি, ভাগ্য তো কৃকলাস।
কুরুক্ষেত্রে ইন্দ্রপ্রস্থ, পরীক্ষিতেরই জয়।
শরৎ-মাধুরী লুট ক'রে ফিরি, জয় জয় ট্রয়লাস।
উল্লাসে গায় পালে-পালে ক্রীতদাস।

বিজয়ী রাজার দানসত্রের শ্রাবণপ্লাবনে ভাসে
পুরজন যত গৃহহীন যত বুভুক্ষু ভিক্ষুক।
হায়েনার হাসি আসে স্মৃতিপটে—বেহিসাবী ক্রেসিডা সে!

তুমি চ'লে গেলে মরণমারীচ মায়াবীর ডাকে মূক
বধির ওষ্ঠাধরে।
তারপরে এলো রণমন্থনে দূর বিদেশের নারী।
কালো সন্ধ্যায় দিলো শ্বেতবাহু দুটি—
স্মরণ তোমার হানে আজো তরবারি!

১৩৬. ঘোড়সওয়ার

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার,
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার?

দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী! বর্শা তোলো।
কেন ভয়? কেন বীরের ভরসা ভোলো?
নয়নে ঘনায় বারে-বারে ওঠাপড়া?
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি?
হৃদয়ে আমার চড়া?

অঙ্গে রাখি না কারোই অঙ্গীকার ?
চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।
এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া ?
মৃগতৃষ্ণিকা দূরদিগন্তে ডাকি ?
আত্মাহুতি কি চিরকাল থাকে বাকি ?

জনসমুদ্রে উন্মথি' কোলাহল
ললাটে তিলক টানো।
সাগরের শিরে উদ্বেল নোনা জল,
হৃদয়ে আধির চড়া।

চোরাবালি ডাকি দূরদিগন্তে,
কোথায় পুরুষকার ?
হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর !
আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর,
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?

\+ − +

হালকা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো'।
সাত সমুদ্র চৌদ্দ নদীর পার—
হালকা হাওয়ায় হৃদয় দু-হাতে ভরো,
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার।

পাহাড় এখানে হালকা হাওয়ায় বোনে
হিমশিলাপাত ঝঞ্ঝার আশা মনে।
আমার কামনা ছায়ামূর্তির বেশে
পায়ে-পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরোথরো।
কামনার টানে সংহত প্রেসিআর।
হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,
হে দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার !

সূর্য তোমার ললাটে তিলক হানে
নিশ্বাস কেন বহিতেও ভয় মানে!
তরঙ্গ তব বৈতরণীর পার।
পায়ে-পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
আমার কামনা প্রেতচ্ছায়ার বেশে।
চেয়ে দেখ ঐ পিতৃলোকের দ্বার!

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার—
মেরুচূড়া জনহীন—
হালকা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে
লোকনিন্দার দিন।

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুষকার?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?

১৩৭. পদধ্বনি

পদধ্বনি!
কার পদধ্বনি
শোনা যায়?
মদির হাওয়ায় রজনীগন্ধার মতো
কেঁপে ওঠে রোমাঞ্চিত রাত্রির ধমনী।
ও কে আসে নীল জ্যোৎস্নাতে
অমৃত-আধার হাতে ও কে আসে আমার দুয়ারে,
বার্ধক্যবাসরে
অসহায় জরাগ্রস্ত পাণ্ডু অস্থিভারে
ছিন্ন ক'রে দিতে আসে সর্পিল উলূপী
তিমিরপঙ্কের স্রোতে, রসাতলসংকুল আঁধারে?

হে প্রেয়সী, হে সুভদ্রা,
তোমার দাক্ষিণ্যভারে
হৃদয় আমার
বার-বার হয়েছে প্রণত,
প্রেম বহুরূপী
যতবার যত ছদ্মবেশে
প্রসন্ন হয়েছে জানি উদ্বৃত্ত সে তোমার লীলার।
মন্থিত স্মৃতির রাত্রে শালীন ঐশ্বর্যে স্বপ্নে বিচ্ছুরিত ঘুম—
বিস্তীর্ণ জীবন ভ'রে বুনে গেছি কত শত আকাশকুসুম—
অভ্যস্ত প্রহরে এই নিয়মের সজ্জিত নিগড়ে
সুরভি নিশীথে,
ক্ষয়িষ্ণু কর্মের প্রান্তে ঘনিষ্ঠ নিভৃতে
হে ভদ্রা, এ কার পদধ্বনি!
ছড়ায় অমনি নক্ষত্রের মণি সে কোন অধরা
উন্মত্ত অপ্সরা!
সুরসভাতলে বুঝি নৃত্যরত সুন্দরী রূপসী
বিভ্রান্ত উর্বশী!
আকস্মিক কামনায় উদ্বেল আবেগে
পদক্ষেপ মাত্রারিক্ত, বহুভুঞ্জিতার
মুদ্রা লোল উচ্ছ্বাসের বেগে।
সে-আতিশয্যের ভার
বিড়ম্বিত ক'রে দেয় পার্থের যৌবন,
মুহূর্তের আত্মদানে সংকুচিত এ-পার্থিব মানবের মন
হে ভদ্রা, এ-হৃদয় আমার
তোমাতে ভরেছে তাই কানায়-কানায়,
প্রেমের একান্ত দানে টলোমলো একাধিকবার
বৈতরণী অলকনন্দায় যমুনা-গঙ্গায়
ঘুরে ফিরে আদি-অন্ত তোমাতে জানায়
সম্মিলিত জীবনের আদিগন্ত মুক্ত মোহানায়।

মনে পড়ে, সে-দিনের ঝড়ে সে কী পদধ্বনি হুংকার, টংকার,
উৎসবের অবসরে
আমাদের পলায়ন প্রেমের বিহ্বল বেগে, হে ভদ্রা আমার,
যাদবের পঙ্গপাল পিছে তাড়া করে,
পিছু-পিছু ছোটে পদধ্বনি,
ক্ষিপ্র কৃষ্ণ ব্যাজ রোষে, স্ফীতোদর হলধর ক্ষিপ্ত ধাবমান,
তোমার নিটোল হাতে উল্লসিত সে-তুরীয় যান,
দেশকালসন্ততির পারে
অবহেলে করেছি প্রয়াণ।
পদধ্বনি, সেই পদধ্বনি
আমাদের স্মৃতির বাসরে
জরিষ্ণু ধমনী ক্ষিপ্র করে,
দেহাতীত এ-তীব্র মিলনে কালোত্তর ক্ষণে
সমগ্র সত্তার অঙ্গীকারে
তোমাকে জানাই আজ, হে বীরজননী,
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী বিরাট চৈতন্যে তাকে করেছো স্বীকার।
তবু পদধ্বনি!
হৃদ্‌পিণ্ডে স্পন্দমান, রক্তে তার দোলা।
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার রেখেছি তো খোলা
তবু কেন এতই অস্থির!
স্মৃতির ঐশ্বর্যে ধনী, বার্ধক্যবাসরে
সঞ্চিত অতীতে জানি গচ্ছিত জীবন,
তবু অভিমানী
কেন অকারণ পক্ষবিধূনন! আর সেই পদধ্বনি!
ও কি আসে নয় অরণ্যের
প্রাক্‌পুরাণিক প্রাণী? অসভ্য বন্যের পিতৃকুল?
দানব-জন্তুর পাল?
দন্তুর ভয়াল
প্রাক্তন পৃথিবী ওঠে নিজস্ব স্মৃতির

করাল অতীত নিয়ে আমার অতীতে ?
আমার সত্তার ভিতে বর্বর রীতির
সে-পার্থিব স্মৃতি
জাগায় পার্থেরও ভয়।
মনে হয় এই পদধ্বনি
এই পদধ্বনি শোনা যায়—
বুঝি ধায়
প্রচণ্ড কিরাত !
উন্মথিত হিমশিলা, তুষারপ্রপাত ঝরে, পলাতক কিন্নরীর দল,
ছিন্নভিন্ন দেওদার-বন !
শালপ্রাংশু হাতে সব পাশবিক বল,
চোখে জলে প্রচ্ছন্ন অনল ! পাশুপত ছল !
আহা ! সে তো শুভ্র আবির্ভাব, দেবতার উদার প্রসাদ !
মিলে গেলো নবশক্তি আত্মদানে উজ্জীবিত ভীত অবসাদ।
তবু আজ এ কী কলরব ! পদধ্বনি ! দুরন্ত মিছিল !
ঘুমন্ত নগর, ঘরে-ঘরে খিল,
উর্ধ্বশ্বাস উৎসবে কাতর বিলাসী যাদব যুবাদল
অতীত-অর্জিত সুখে এলোমেলো অলস ভোগের
স্বার্থপর আবিষ্কারে ক্লান্তিভারে নিদ্রান্ধ বিকল।
হায়, কালের ধারায়
নিয়মে হারায় পার্থসারথির পরাক্রম।
বটের ছায়ার মতো, সর্বক্ষম নেতার রক্ষায়
ছত্রধর নেই আজ সম্পূর্ণ মানব।
স্মৃতি তার দ্বারকায় অবসরবিনোদনে লোটে ;
স্মৃতি তার কদম্বছায়ায়, যমুনার নীল জলে বৃথা মাথা কোটে।
তবু এই শিথিল প্রহরে
নূপুরমঞ্জীরে ঘোর শঙ্খরবে মেতে ওঠে কার পদধ্বনি !
পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ! কারা আসে সংকুল আঁধারে
তিমিরপক্ষের স্রোতে প্রান্তর ও অরণ্যকে ছিঁড়ে

উল্কার উন্মত্ত বেগে ভূকম্পের উচ্চ হাহাকারে
বিষায়ে রক্তের স্রোত, আচম্বিতে কাঁপায়ে ধমনী
কার পদধ্বনি আসে? কার?
এ কি এলো যুগান্তর! নব অবতার!
এ যে দস্যুদল!
হে ভদ্রা আমার!
লুব্ধ যাযাবর! নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে,
দ্বারকার অঙ্গনে-অঙ্গনে
চায় তারা রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী,
চায় তারা ফসলের খেত, দিঘি ও খামার,
চায় সোনাজ্বলা খনি। চায় স্থিতি, অবসর।
দস্যুদল উদ্ধত বর্বর
আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিষ্যে নির্ভর
দস্যুদল এলো কি দুয়ারে?
পার্থ যে তোমার
অক্ষম বিকল, ভদ্রা, গাণ্ডীবের সে-অভ্যস্ত ভার
আজ দেখি অসাধ্য যে তার!
চোখে তার কুরুক্ষেত্র, কানে তার মত্ত পদধ্বনি,
ক্ষমা কোরো অতিক্রান্ত জীর্ণ অস্থয়ারে।
ব্যর্থ ধনঞ্জয় আজ, হে ভদ্রা আমার!

হে সঞ্জয়, ব্যর্থ আজ গাণ্ডীব অক্ষয়।

১৩৮. আইসায়ার খেদ

বয়স হয়েছে ঢের, পেনসনই তো পঁচিশ বছর।
সবুজ সবুজ নদী আজ প্রায় নীলিমা ভাস্বর।
কর্ম সবই পণ্ডশ্রম, চাকরি সে তো পেটের চাহিদা,

গর্বের বিষয় কম—কখনো নজর তথা সিধা
নিইনি, সান্ত্বনা তাতে যেটুকু এ-পঁচিশ বছর।

বয়সে পেনসন নিই, জন্ম থেকে পঞ্চান্ন হবছ,
জীবন উঠতি ছিলো ছোটোখাটো ব্যর্থতার মাঠে,
করিনি তছনছ কারো প্রাণমন রাজদণ্ডধর
মুরুব্বি পাকড়ি' বক্ষে উচ্চাশার অন্ধ পাখসাটে,
কৃষ্ণপদে নেত্র বুজে ফেলিনিকো থিয়েটারি লোহ।

সেকালে শুনেছি গল্প ব্রহ্ম-শিখ-সিপাহি-বিদ্রোহ,
আতঙ্ক উল্লাস তার উত্তেজনা—কন পিতামহ।
সুদূর গল্পের রেশ, মনে পড়ে বুওর সমর,
অসহায় পক্ষপাত, তারপরে আবার আবহ
ঘনালো পশ্চিমে, সেই এমডেন জাহাজের মোহ!

সবুজ সবুজ নদী আজ নীল সুনীলে ভাস্বর,
তবু ভাবি যন্ত্রণায় মাথা কুটে একান্ত অসহ-
যোগের সে-আন্দোলনে ব্যর্থ হাকিমের রূঢ় স্বর
নদীতে মোচার খোলা কাঁপে কোন বেগে ভয়াবহ—
মাথা তুলে পথ চলি, চৌরঙ্গির ফুরালো সম্মোহ!

শুনেছি অমাস্য মন্দ, তবু তো সে-অমাস্য-উৎসবে
আমার ঘরেও সাড়া পড়েছিলো পেনসনের ঘর!
চাষিরা চালায় কাস্তে, মজুরেরা মুষ্টিবদ্ধ খাটে।
তারপরে কালযুদ্ধ মৃত্যু আর মৃত্যু মন্বন্তর
ক্রমান্বয়ে মহামারী নরকের নবান্ন-উৎসবে।

নরক কি এ-রকম? বাংলার গ্রাম ও শহরে
লক্ষ জন দগ্ধগৃহ, কেউ বেশ ওসারে বহরে,

নরকে জানে না শুনি আছে তারা দুরন্ত নরকে,
রৌরব-প্রাসাদে হাসে শাদা কালো গৌরব প্রহরে,
দধীচির হাড় জ্বলে, কী দেয়ালি বিবস্ত্র মড়কে!

কী জানি, বৃদ্ধ যে দন্তনখহীন, আশিটি বছর
জরিষ্ণু মানসে ভাসে, সামান্য চাকুরে চিরকাল।
বাড়িতে অশান্তি ঘোর, সন্তানের সন্তানেরা শত
মতামতে ভাঙে ঘর, একজন কারবারে লাল
অকালে, আবার দেখি ছোটো জন অসিধারব্রত

যুদ্ধে দেয় পক্ষপাত, বলে আজ কালের ঘর্ঘর
এ-যুদ্ধে এনেছে ফের পাঞ্চজন্য, দাবি পক্ষপাত,
বলে, বিশ্ব এক; শনিগ্রহদের কক্ষপাত
সেও নাকি মানুষের হাতে; দেখি নয়নে ভাস্বর
তার নীল নদী বয়, দুই তট সবুজ উর্বর।

আমার বয়স ঢের, দেখি তার পঁচিশ বছর।

১৩৯. ভিলানেল

দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে
সে-কার হাওয়া আনে বনের নীল ভাষা।
জোগায় কথা তাই সোনালি নদীকূলে।

আলোর ঝিমিঝিকি তোমার কালো চুলে,
উষার ভিজে মুখে দিনের স্মিত আশা,
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে

পরশ মেলে-মেলে তুমি যে ধরো খুলে,
হৃদয় সে-উষায় থামায় যাওয়া-আসা,
জোগায় কথা তাই সোনালি নদীকূলে।

কে খোঁজে পথে আর কে ঘোরে পথ ভুলে;
অস্ত-গোধূলিকে কে সাধে দুর্বাসা
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে?

ঈশান মেঘে আর ওঠে না দুলে-দুলে
ত্বরিতে কাঁদে আর চকিতে মৃদু হাসা,
জোগায় কথা তাই সোনালি নদীকূলে।

সে-তরু এ-হৃদয়, তুমি যে-তরুমূলে
বসেছো ফুলসাজে, ছায়ায় দাও বাসা
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা-ফুলে,
জোগায় কথা তাই সোনালি নদীকূলে।

১৪০. হোমরের ষট্‌মাত্রা

ছিলো একদিন কস্তরীমৃগ কৈশোরকের চিত্তে
ঝর্নার বেগ, দ্রুতমুহূর্ত পাহাড়ে মাত্রাবৃত্তে
তীব্র তড়িতে মেলাতে চেয়েছি ক্ষণিকাকে চুম্বনে
সংবৃত একা ত্রিকালথোদাই পরম চিরন্তনে।
গ্রীষ্মে ঝর্না হারায় পাথরে বালিতে,
বর্ষায় ছোটে ঢল ভেঙে জল ঢালুতে।
আজকে দু-পাশে সমুদ্র দূর দিকে-দিকে দেয় পাড়ি,
অনেক নৌকা বিদেশী জাহাজ গাংচিল ঝাঁকে-ঝাঁকে,
হৃদয়ে মিশেছে আরেক কালের অনেক দেশের খাড়ি,
পাহাড়ের বেগ স্মৃতিমন্থিত আরেক বেগের বাঁকে।

সেদিন আমার বাসা ছিলো মাঘফাল্গুনে,
বিভোল সে-গানে কালের ত্রিতাল কে শোনে!
অনেক জনের অনেক দিনের বহু বছরের স্রোতে
কত না রৌদ্রে স্বরবেস্বরের ঊর্মিল সংগীতে
তোমার আপন আবেগে মেলাই আমার সাগরযাত্রা,
সাফোর ঝর্না কলকল্লোলে-হোমরের বট্‌মাত্রা।

১৪১. বোহিনিয়া

কোথায় গিয়েছে সেই দিন! তার স্মৃতি
আজ শুধু একাকিত্বে জাগে।
অন্য যে, সে জীবনের যুদ্ধে বীর কৃতী;
কৃতিত্ব কোথায় বলো স্মৃতির সংরাগে?

সময়ের দুই পিঠে দিয়ে জোড়াতালি
একজন আজও দেখে নিবিড় আকাশ,
সেই ঘর, জানলার পাশে বোহিনিয়া,
সে-গাছে দু-জন লোক এক অবকাশ
জোড়ে-জোড়ে গেঁথেছিলো।
আজ একজন
সে-গাছে খোঁজে না ফুল, ডেলিয়া জিনিয়া
সিঁড়ির দু-ধারে টবে রাখে তার মালি।

অন্য ঘরে সেই ফুল রাখে একজন,
বেয়ারাই আনে খাসকামরায় ডালি।

আমার ঘরের পাশে ঝরে বোহিনিয়া।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য (জ. ১৯০৯)

১৪২. নীলিমাকে

রাত্রিতে জেগে ওঠে যে-সাগর
অন্ধকারের সাগর—
তুমি তাতে স্নান ক'রে এসো, নীলিমা,
তোমার চোখ হোক আরো নীল
চুল হোক ধূসর ফুলের মঞ্জরীর মতো।

আর যদি রাত্রিকে বিদীর্ণ ক'রে ওঠে চাঁদ
তোমার আঁচলে লেগে থাকে যেন সিক্ত জ্যোৎস্না
তোমার বুকে পাই যেন জ্যোৎস্নার গন্ধ ;
বলতে পারো, সে-জ্যোৎস্না কি নীল হবে, নীলিমা,
নীল পাখির পালকের মতো ?
জানি, তুমি আমায় ডাকবে—
(নীল বন কি কথা ক'য়ে উঠলো—
আর মেঘের গায়ে-গায়ে নেমে এলো স্বপ্নরা ?)
আমার চোখ নরম হ'য়ে আসবে ঘুমে, নীলিমা,
তোমাকে নয়, তোমার স্বপ্নকে পেয়ে।

১৪৩. রাত্রিকে

রাত্রিকে কোনোদিন মনে হ'তো সমুদ্রের মতো।
আজ সেই রাত্রি নেই।
হয়তো এখনো কারো হৃদয়ের কাছে আছে সে-রাত্রির মানে।
আমার সে-মন নেই
যে-মন সমুদ্র হ'তে জানে।

একবার ঝ'রে গেলে মন
সেই ঝরা ফুল আর কুড়োবার নেই অবসর ;

তখন প্রখর সূর্য জীবনের মুখের উপর
তখন রাত্রির ছায়া জীবনের আয়ুর উপর
জীবন তখন শুধু পৃথিবীর আহ্নিক জীবন।

১৪৪. মনে থাকবে না

মনে থাকবে না!
এই আলো, এ-বিকেল, এই বেচা-কেনা,
এই কাজ—প্রেম, রাঙা জীবনের দেনা
এ-নিবিড় পৃথিবীর, নিজেদের হঠাৎ এ-চেনা
মনে থাকবে না।

তবু কিছু থাকবে কোথাও,
এই আলো এই ছায়া যখন উধাও,
বিকেলের উপকূলে বিকেলের শ্বাস ফেলে চুপচাপ ঝাউ
আলো-লাগা, ভালো-লাগা মন—নেই তা-ও—
তখনো হয়তো কিছু থাকবে কোথাও।

তখনো থাকবে ছবি তোমার-আমার।
দেখবে পারো না একা হৃদয়ে তাকাতে তুমি আর,
যতবার
তাকাবে দেখবে কেউ আছে তাকাবার;
অপলক চোখ যেন কার
তোমার চোখের পাশে—হয়তো আমার।

১৪৫. আলাপ

বিকেল-সূর্যের মুখে ঠিক যেন ভোরে-পাওয়া মন।
আমি এক মহিলাকে দেখছি এখন।
খানিক ময়লা আলো ঘাসে গাছে পাতায় লতায়,
দু-জনের চুপ-ক'রে-থাকা জিভে, হঠাৎ কথায়,

শুধু ঠোঁটে খেলছে বিদ্যুৎ,
তবু সাবধান পাছে ভবিষ্যৎ আসে রাত্রি-কালি-মাখা ভূত।

১৪৬. পূর্ণিমার জন্য

[শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কে নিবেদিত]

মরকত নীল আমি সমুদ্রের মতো
তোমাকে নাবাল-ভূমি ডাকছি সতত :
এসো এসো ষোড়শী আমার, উপকূল
নারিকেল উপচার পাঠিয়েছে, ভুল
এবার হবে না আর দেবতা ফিরিয়ে।
প্রবাল-দেহের সঙ্গে হৃদয়ের বিয়ে
তুমি নেমে এলে হবে। এসো সপ্তপদ
একবার, তারপর লোভ মোহ মদ
সব পাবে, পাবে এক সজ্জিত বাসক,
জলকন্যা, তারাদল (নয় ভয়ানক)
তোমারি মতন তারা মাটির শরীর
পৃথিবীর মহানীরে নীড় খুঁজে তীর
পেয়েছে পাতালে। বাতি জ্বলে অন্ধকারে।
সব অন্ধকারে বাতি জ্বলে সারে-সারে।

অরুণ মিত্র (জ. ১৯০৯)

১৪৭. অমরতার কথা

বাসনগুলো এক সময়ে জলতরঙ্গের মতো বেজে উঠবে। তার ঢেউ দেয়াল ছাপিয়ে পৃথিবীকে ঘিরে ফেলবে। তখন হয়তো এই ঘরের চিহ্ন পাওয়া যাবে না। তবু আশ্চর্যকে জেনো। জেনো এইখানেই আমার হাহাকারের বুকে গাঢ় গুঞ্জন ছিলো।

আমার বদ্ধ বাতাসে যে-গান পাষাণ হ'য়ে থাকে তা ভেঙে ছিটিয়ে পড়ুক, কল্পনার স্বর সমুদ্র হোক এই আশায় আমি অথই। অবিশ্রাম অনুরণনে পাঁচিল

ধ্ব'সে যাবে, কলরোলে ভিটেমাটি তলাবে। তখন ঘূর্ণির পাকে বুঝে নিয়ো কোথায় সেই বিন্দু যেখান থেকে জীবন ছড়িয়ে পড়লো মৃত্যুর গহ্বরে।

কাঠকুটো আসবাব আবার বন্য হ'য়ে উঠবে। ওরা কচি পাতার ঝিলিমিলি মুড়ে ঝিমোয়, ভিতরে-ভিতরে কোথায় হারিয়ে থাকে অঙ্কুরের ঝাপটানি। তবু সূর্য ডুবলে আমার চোখে বার-বার ঘনিয়ে আসে বন।

ওরা আবার বন্য হ'য়ে উঠবে। আমার ছাত দেয়াল মেঝের শূন্যতা ভ'রে অরণ্য জাগবে। সবুজের প্রতাপে এই শুকনো কাঠামো চূর্ণ হবে। সেই ধ্বংসের গহনে খুঁজে নিয়ো আমার বসতি, যেখানে পোড়ামাটি-ইটের ভিতরে রস ছিলো অমৃতের মতো।

অশোকবিজয় রাহা (জ. ১৯১০)

১৪৮. ফাল্গুন

ছিটকিনি নড়ে উপরের জানালায়,
একটু কবাট ফাঁক,
চুড়ির ঝিলিকে একটু আলোর চিড়,—
দুইখানি শাদা হাত :
দুইটি কবাট দুই দিকে স'রে যায়।
গোধূলির আলো পাখা ঝাপটায় চোখে-মুখে-বুকে এসে,
ধু-ধু হাওয়া খেলে এলোচুলে, পর্দায়।

নদীর ও-পারে আকাশে আবির-ঝড়,
আলতা গলেছে জলে,
হাওয়া-জানালায় চোখে-মুখে কাঁপে ঝিকিমিকি আবছায়া,
ধু-ধু হাওয়া এলোচুলে,—

দূরে এক কোণে পলাশের ডালে আগুন লেগেছে চাঁদে।

১৪৯. মায়াতরু

এক-যে ছিলো গাছ,
সন্ধে হ'লেই দু-হাত তুলে জুড়তো ভূতের নাচ।
আবার হঠাৎ কখন'
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে মেঘ উঠতো যখন
ভালুক হ'য়ে ঘাড় ফুলিয়ে করতো সে গরগর
বৃষ্টি হ'লেই আসতো আবার কম্প দিয়ে জ্বর।
এক পশলার শেষে
আবার যখন চাঁদ উঠতো হেসে
কোথায় বা সেই ভালুক গেলো, কোথায় বা সেই গাছ,
মুকুট হ'য়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ।

ভোরবেলাকার আবছায়াতে কাণ্ড হ'তো কী-যে
ভেবে পাইনে নিজে,
সকাল হ'লো যেই
একটিও মাছ নেই,
কেবল দেখি প'ড়ে আছে ঝিকির-মিকির আলোর
রুপালি এক ঝালর।

১৫০. ভাঙলো যখন দুপুরবেলার ঘুম

ভাঙলো যখন দুপুরবেলার ঘুম
পাহাড়-দেশের চারদিক নিঃঝুম,
বিকেলবেলার সোনালি রোদ হাসে
গাছে পাতায় ঘাসে।
হঠাৎ শুনি ছোট্ট একটি শিস,—
কানের কাছে কে করে ফিসফিস ?
চমকে উঠে ঘাড় ফিরায়ে দেখি,
এ কী !

পাশেই আমার জানলাটাতে পরির শিশু ছুটি
শিরীষ গাছের ডালের 'পরে করছে ছুটোছুটি।

অবাক কাণ্ড—আরে!
চারটি চোখে ঝিলিক খেলে একটু পাতার আড়ে!
তুলতুলে গাল, টুকটুকে ঠোঁট, খুশির টুকরো ছুটি
পিঠের 'পরে পাখার লুটোপুটি,
একটু পরেই কানাকানি, একটু পরেই হাসি—
কচি পাতার বাঁশি—
একটু পরেই পাতার ভিড়ে ধরছে মুঠোমুঠি
রাংতা-আলোর বুটি।
এমন সময় কানে এলো পিটুল পাখির ডাক,
একটু গেলো ফাঁক,—
এক ঝলকে আর-এক আকাশ চিড় খেয়ে যায় মনে
আরেক দিনের বনে,—
তারি ফাঁকে পাৎলা রোদের পর্দাটুকু ফুঁড়ে
এরাও গেলো উড়ে,
রইলো প'ড়ে ঝরা পাতা, রইলো প'ড়ে ঢালু,
পাহাড়-ধসা লাল গুহাটার হাঁ-করা ঐ তালু।

বিমলচন্দ্র ঘোষ (জ. ১৯১০)

১৫১. এক ঝাঁক পায়রা

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা
সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে,
চঞ্চল পাখনায় উড়ছে।
নিঃসীম ঘননীল অম্বর
গ্রহতারা থাকে যদি থাক নীল শূন্যে।

হে কাল, হে গম্ভীর,
অশান্ত সৃষ্টির
প্রশান্ত মন্থর অবকাশ,
হে অসীম উদাসীন বারোমাস!

চৈত্রের রৌদ্রের উদ্দাম উল্লাসে
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
শুধু শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা।

দুপুরের রৌদ্রের নিঃঝুম শান্তি
নীল কপোতাক্ষীর কান্তি
এক ফালি নাগরিক আকাশে
কালজয়ী পাখনার চঞ্চল প্রকাশে—
চৈতালি সূর্যের থমথমে রৌদ্রে
জীবন্ত উল্লাসে উড়ছে
পাঁচরঙা এক ঝাঁক পায়রা॥

একফালি আকাশের কোল-ঘেঁষা কার্নিশ
রংচটা গম্বুজ, দিগন্তে চিমনি,
সোনার প্রহর কাঁপে চঞ্চল পাখনায়
ছোট্ট কালের ঘোরে প্রাণ তবু তন্ময়
লীলায়িত বিস্ময়।
সৃষ্টির স্বাক্ষর এক ঝাঁক পায়রা।

রুপালি পাখায় কাঁপে ত্রিকালের ছন্দ
দুপুরের ঝলমলে রোদ্দুর,
হে কপোত, পারাবত, পায়রা,
যে-দিকে দু-চোখ যায় দেখা যায় যদ্দুর
রুপালি পাখায় আঁকা শূন্য।

আকাশী-ফুলের শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
কম্পিত শত-শত উড়ন্ত পাপড়ি
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
দুপুরের ঝলমলে জীবন্ত রৌদ্রে
ওড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা।

১৫২. দুপুরবেলার চম্পু

সারা দুপুর ব'সে ছিলুম বকুল গাছের তলায়।
আশেপাশে কত গাছপালা
কত ফল-ফুল, কত লতা-পাতা,
বর্ষা তখন শেষ হয়েছে
আকাশ তখন স্বচ্ছ
মেঘেরা সব হারিয়ে গেছে নিরুদ্দেশের পথে।

কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছি
বলতে-না-পারা বনের মিঠে গন্ধ,
সামনে খানিকটা জল জ'মে আছে
অনেক দিনের আকাশ-ঝরা জল।

সে-জল তখনো শুকোয়নি
বেরুবারও পায়নি পথ
ভিজে মাটির আলিঙ্গনে নববধূর মতো কাঁপছে।
তার বুকের তলায় থিতিয়ে আছে
অনেক মাটি, অনেক কাঁকর—
অনেক ছিন্ন মুকুল
অনেক জীর্ণ ঝরা পাতা।

তার সেই বাতাস লেগে শিউরে-ওঠা বুকের ওপর,
লুটিয়ে পড়েছে দুপুরবেলার সূর্য,
পতির অনুপস্থিতিতে গোপনচারী উপপতির মতো

ভয়ে-ভয়ে, সন্তর্পণে,
দুপুরবেলার বিজন অবকাশে।

হঠাৎ একটু দূরেই দেখি
একটা বাতাবি গাছ আর বাবলা গাছের ফাঁকে
অপূর্ব অদ্ভুত এক ছবি,
হার মানে তার রং ধরাকে মানুষ-শিল্পীর তুলি,
কল্পনাও থমকে দাঁড়ায় কিছুক্ষণের শোভায়
মুগ্ধ হ'য়ে অবাক হ'য়ে দেখি :

ভোরবেলাকার শিশিরকণার মুক্তো দিয়ে গাঁথা
উর্ণনাভের সূক্ষ্ম জালে সোনার কিরণ লেগে
ছোট্ট গীতিকাব্য একটি কাঁপছে থরোথরো
উর্ণনাভের আটটি বাহুর কোমল আলিঙ্গন।

দেখতে-দেখতে ভুলে গেলুম আমার জীবন,
আমার মরণ, আমার লক্ষ মায়া।
উর্ণনাভের সামাজিক নামটা উচ্চারণ করতে
মনে আঘাত পেলুম।

ভাবলুম উর্ণনাভ ভালোবাসে
দুপুরবেলার সোনালি সূর্যকে
আর তার হীরকবর্ণ অদ্ভুত দুটি চোখে দেখলুম
গহন রাতের অপূর্ব এক মায়া।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র (জ. ১৯১১)

১৫৩. গুহার গান

প্রভু!
তোমার মাথায় পড়ে স্বচ্ছ শুভ্র রাতের কণিকা।
তোমাকে রয়েছে ঘিরে আঁধারের নীরব আলোক।

আমি আছি অতল গুহায়।
বুকের উপর চেপে রয়েছে অজ্ঞতা,
গভীর সে-রাত,
স্তূপীকৃত পাহাড়ের সমাধির মতো।
আমি যেন শুনতে পাই আমার এ-সমাহিতি থেকে
নরম রাতের চূর্ণ বিন্দু-বিন্দু ঝরে,
কালো আঙুরের মতো গুচ্ছ-গুচ্ছ
তোমার ও-চুলে।

প্রভু!
তোমার বিশাল হাত আমাকে ফিরেছে খুঁজে, জানি,
শিকারি হাতের ছায়া কেঁদে গেছে দেহের উপর।
আমার বুকের রক্ত হয়নিকো এখনো তো হিম।
এক বিন্দু উষ্ণতায় যদি জ্বলে জীবন আমার,
এক বিন্দু চোখের আভায়,
এ-বন্ধন বন্ধুই আমার।

প্রভু!
তোমার মাথার 'পরে অর্ঘ্য পড়ে
অনাদি রাতের!
তার ঘন সুরভির ঝড়
আমার অসাড় দ্বারে করে করাঘাত,
চ'লে যায় গ্রহলোক-পানে।
আমি থাকি প'ড়ে অসহায়।
পক্ষাঘাত দুর্ভেদ্য প্রহরী।
তোমার কুঠারে করো বিচূর্ণ আমায়।
দু-হাত ছড়িয়ে দাও রাতের আকাশে।
আমার এ-গুহাকাশে বজ্র হানো, প্রভু,
দগ্ধ হোক আমার এ-শব।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় (জ. ১৯১৪)

১৫৪. রাজকুমার

হে রাজকুমার! উজ্জ্বল খর নভে
রাজ্যশাসন ও দিগ্বিজয়ের কালে
কেঁপেছে নগর অম্বুনিনাদী রবে,
মুণ্ডনিপাত করেছো তালবেতালে।

রূপসীরা কত তব অলক্ত-পদে
বশীকরণের মায়াবী মন্ত্র প'ড়ে
সঁপেছে তোমাকে রতি-সুখ-সার মদে।
নারীমেদ-ভারে প্রাসাদ উঠেছে গ'ড়ে।

রমণীমোহন নবনীকান্ত, যেন
গোধূলি-লালিমা পড়েছে অধরে মুখে;
রাজকবি যত বিরচি' নান্দী, হেন
মণিকুট্টিম কাঁপায়েছে সুর-সুখে।

জানি না সে কোন রজনীর অবসানে—
(অমাত্যদের ষড়যন্ত্রের বিষে)
বারেক ফিরায়ে হৃত রাজ্যের পানে
অশ্বখুরের ধুলায় গিয়েছো মিশে।

হাত-বদলের ঘটা সে কী নির্মম!
নূতন পতাকা উড়েছে প্রাসাদচূড়ে!
ঝঞ্ঝাতাড়িত চ্যুত পত্রের সম
স্মরণ তোমার কখন গিয়েছে উড়ে।

তারপর এ কী! বিধির অপার ছলে
দেখি যে তোমার তরণী বোম্বাই ঘাটে।
টাকার দাপটে হরেক রকম কলে
জনগণমন উঘায়ু যত কাটে।

জলবায়ু মাটি আবার তোমার হাতে।
জনসম্পদে করো কোম্পানি ঠেসে।
শেয়ার-বাজার 'তেজিমন্দি'র সাথে
গড়াগড়ি যায় তোমার পায়েতে এসে।

কত ভাবে ভোল দেখালে কুমার তবে।
মুলতুবি করো বেসাত গায়ের জোরে!
রচি' ব্যূহজাল গোয়েন্দা ল'য়ে ভবে
রেখেছো ঘিরিয়া সুচির দুর্গ-'পরে।

আজ অবশেষে জনগণে মিশি নেতা।
অ্যাসেমব্লি হল্ জমাট করো কি সাধে?
ক্রেতা-বিক্রেতা তুমিই তাদের সেথা।
রক্তের দাগ ঢাকবে আর্তনাদে।

বিরাম মুখোপাধ্যায় (জ. ১৯১৪)

১৫৫. অন্তর্জলি

কঠিন মাটির মায়া কঙ্কাল-মুঠিতে,
দুই পা পাতালে;
বধির শ্রবণে তবু ঘন-ঘন শান্তির প্রলাপ—
রাম নাম সত্য শত বার।
খুলবে কি বৈকুণ্ঠের দ্বার?

ভাঙা সিঁড়ি—
পথ কি স্থগিত?
ভাঙা সিঁড়ি খাড়া-উঁচু মঙ্গলগ্রহের কাছাকাছি।

সকালের বেগনি কুয়াশা
দুপুরের দিকে বুকে হালকা আলোর দাগ কাটে ;
হয়তো স্থগিত পথ ঠিকাদার-হাত ছুঁয়ে
শেষ হয় আর-এক বৈকুণ্ঠের সোনার কপাটে।

চড়া রোদ—
চোখে ধাঁধা লাগে ?
চড়া রোদে ঘোঁড়া ছোটে ফটকা-বাজারে,
—নাগালের কাছাকাছি সোনার হরিণ।

ক্লান্তির বিকার শুদ্ধি পড়ন্ত বিকেলে—
কোটিপতি ঠিকাদার ডুবে যায় রুপালি পর্দায়,
—কী অগাধ শান্তি দেয় ভায়োলেট চোখ আর
তিলোত্তমা-হাসি !

নীল রাত—
রক্তে মৌল নেশা ?
বেশ্যা-রাত্রি প্রেমের নিলাম হাঁকে দম্পতি-শরীরে,
পদ্মিনী জরায়ু ক্লান্ত, কন্দর্প নাকাল।
কী মাহাত্ম্য পুত্রেষ্টির !
তবু রাম নাম।

কঠিন মাটির মায়া কঙ্কাল-মুঠিতে,
দুই পা পাতালে ;
নাভিশ্বাসে মৃগনাভি—বুঝি ক্ষীণ আয়ুর আশ্বাস !
বানপ্রস্থে প্রতিশ্রুত দুটি পায়ে কার্পেট-আরাম—
শত বার সত্য রাম নাম।
সত্য রাম নাম।

দিনেশ দাস

(জ. ১৯১৫)

১৫৬. কাস্তে

বেয়নেট হোক যত ধারালো—
কাস্তেটা ধার দিয়ো, বন্ধু!
শেল আর বম হোক ভারালো
কাস্তেটা শান দিয়ো, বন্ধু।

নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ-যুগের চাঁদ হ'লো কাস্তে!

ইস্পাতে কামানেতে দুনিয়া
কাল যারা করেছিলো পূর্ণ,
কামানে-কামানে ঠোকাঠুকিতে
আজ তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ:

চূর্ণ এ-লৌহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত-সমুদ্রে
গ'লে পরিণত হয় মাটিতে,
মাটির—মাটির যুগ ঊর্ধ্বে!

দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই! চেয়ে ছাখো বন্ধু!
কাস্তেটা রেখেছো কি শানায়ে
এ-মাটির কাস্তেটা, বন্ধু!

১৫৭. মৌমাছি

জীবন্ত ফুলের ঘ্রাণে
দুপুরের মিহি স্বপ্ন ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেলো:

জেগে দেখি আমি,
এসেছে আমার ঘরে ছোটো এক বুনো মৌমাছি,
ডানায়-ডানায় যার অরণ্য-ফুলের কাঁচা ঘ্রাণ
পাণ্ডুটে শরীরে যার সোঁদা গন্ধ অজানা বনের।
কেমন সুন্দর ওই উড়ন্ত মৌমাছি।
অশ্রান্ত করুণ ওর গুনগুনানিতে
কেঁপে ওঠে মাটির মসৃণতম গান,
আর দূর পাহাড়ের বন্ধুর বিষণ্ণ প্রতিধ্বনি।
যেন আজ বাহিরের সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত আকাশ
আমার ঘরের মাঝে তুলে নিয়ে এলো
কোথাকার ছোট্ট এক বুনো মৌমাছি।

মৃণালকান্তি

(জ. ১৯১৫)

১৫৮. দিগন্ত

(অংশ)

রৌদ্রদগ্ধ

জেনেছি ব্যর্থ ফুল-ফোটাবার গান!
মৌমাছি কল্পনা,
রৌদ্রদগ্ধ তাদের রঙিন ডানা।
ঐ বনছায়া,
নিরালা রাতের চাঁদ—
স্বপ্ন-জোনাকিগুলি,
উষার ধূসর
অঞ্চল নেয় তুলি।

* * *

খেয়া

এপারে মৃত্যু, ওপারে অন্ধকার।
দিবারাত্রির সেতুবন্ধনে, হে সুদূর, অজানার
খেয়া করো পারাপার।

নাম

পউষের ঝরাপাতা গান শুনি।
একা-একা তবু স্বপ্ন বুনি—
রৌদ্র ছায়া দূর নীলে
প্রাণের নিখিলে
শুনি নিরন্তর,
সেই নাম অনাহত
একটি গানের মতো।

১৫৯. একটি প্রশ্ন

এক ঝলক সোনালি রোদ,
উদাসীন দুপুরের চিল,
মৌমাছির অলস গুঞ্জন
বেগুনি ঘাসফুল—
এর চেয়ে কি সুন্দর
সেই রং-করা রাজবাড়ি—
যে-কল্পনায় তুমি
ক্লান্ত, ধূসর?

সমর সেন (জ. ১৯১৬)

১৬০. বিরহ

রজনীগন্ধার আড়ালে কী যেন কাঁপে,
কী যেন কাঁপে
পাহাড়ের স্তব্ধ গভীরতায়।

তুমি এখনো এলে না।
সন্ধ্যা নেমে এলো: পশ্চিমের করুণ আকাশ,

গন্ধে-ভরা হাওয়া,
আর পাতার মর্মর-ধ্বনি।

১৬১. মেঘদূত

পাশের ঘরে
একটি মেয়ে ছেলে-ভুলানো ছড়া গাইছে,
সে-ক্লান্ত সুর
ঝ'রে-যাওয়া পাতার মতো হাওয়ায় ভাসছে,
আর মাঝে-মাঝে আগুন জ্বলছে
অন্ধকার আকাশের বনে।

বৃষ্টির আগে ঝড়, বৃষ্টির পরে বন্যা। বর্ষাকালে,
অনেক দেশে যখন অজস্র জলে ঘরবাড়ি ভাঙবে,
ভাসবে মূক পশু আর মুখর মানুষ,
শহরের রাস্তায় যখন
সদলবলে গাইবে দুর্ভিক্ষের স্বেচ্ছাসেবক,
তোমার মনে তখন মিলনের বিলাস,
ফিরে যাবে তুমি বিবাহিত প্রেমিকের কাছে।
হে ম্লান মেয়ে, প্রেমে কী আনন্দ পাও,
কী আনন্দ পাও সন্তানধারণে ?

১৬২. বিস্মৃতি

ভুলে-যাওয়া গন্ধের মতো
কখনো তোমাকে মনে পড়ে।
হাওয়ার ঝলকে কখনো আসে কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত আভাস।
আর মেঘের কঠিন রেখায়
আকাশের দীর্ঘশ্বাস লাগে।
হলুদ রঙের চাঁদ রক্তে ম্লান হ'লো,
তাই আজ পৃথিবীতে স্তব্ধতা এলো,
বৃষ্টির আগে শব্দহীন গাছে যে-কোমল, সবুজ স্তব্ধতা আসে।

১৬৩. তুমি যেখানেই যাও

তুমি যেখানেই যাও,
কোনো চকিত মুহূর্তের নিঃশব্দতায়
হঠাৎ শুনতে পাবে
মৃত্যুর গম্ভীর, অবিরাম পদক্ষেপ।

আর, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে ?
তুমি যেখানেই যাও
আকাশের মহাশূন্য হ'তে জুপিটারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি
লেডার শুভ্র বুকে পড়বে।

১৬৪. মুক্তি

হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এলো—
তখন পশ্চিমের জলন্ত আকাশ রক্তকরবীর মতো লাল
সে-অন্ধকার মাটিতে আনলো কেতকীর গন্ধ,
রাত্রের অলস স্বপ্ন
এঁকে দিলো কারো চোখে,
সে-অন্ধকার জেলে দিলো কামনার কম্পিত শিখা
কুমারীর কমনীয় দেহে।

কেতকীর গন্ধে দুরন্ত,
এই অন্ধকার আমাকে কী ক'রে ছোঁবে ?
পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,
আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।

১৬৫. উর্বশী

তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো !

কিংবা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে,
হে ক্লান্ত উর্বশী,
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্ণমুখে
উর্বর মেয়েরা আসে :
কত অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি,
কত দীর্ঘশ্বাস,
কত সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো,
আর কত দিন !

১৬৬. একটি মেয়ে

আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে
আজ তোমার আবির্ভাব হ'লো :
স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর, শুভ্র বুক,
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,
আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস ;
আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের দুর্বল, ভীরু অন্তরে
সে-উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার।

১৬৭. মহুয়ার দেশ

১

মাঝে-মাঝে সন্ধ্যার জলস্রোতে
অলস সূর্য দেয় এঁকে
গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ,
আর আগুন লাগে জলের অন্ধকারে ধূসর ফেনায়।
সেই উজ্জ্বল স্তব্ধতায়
ধোঁয়ার বঙ্কিম নিশ্বাস ঘুরে-ফিরে ঘরে আসে
শীতের দুঃস্বপ্নের মতো।

অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দু-ধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।

২

এখানে অসহ্য, নিবিড় অন্ধকারে
মাঝে-মাঝে শুনি
মহুয়া-বনের ধারে কয়লার খনির
গভীর, বিশাল শব্দ,
আর শিশিরে-ভেজা সবুজ সকালে
অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক,
ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়
কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন।

১৬৮. স্বর্গ হ'তে বিদায়

৪

সমুদ্র শেষ হ'লো,
আজ দুরন্ত অন্ধকার ডানা ঝাড়ে
উড়ন্ত পাখির মতো।
সমুদ্র শেষ হ'লো :
গভীর বনে আর হরিণ নেই,
সবুজ পাখি গিয়েছে ম'রে,
আর পাহাড়ের ধূসর অন্ধকারে
দুরন্ত অন্ধকার ডানা ঝাড়ে
উড়ন্ত পাখির মতো।

সমুদ্র শেষ হ'লো,
চাঁদের আলোয়
সময়ের শূন্য মরুভূমি জলে।

১৬৯. একটি বেকার প্রেমিক

চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি

সকালে কলতলায়
ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে,
খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি ;
মাঝে-মাঝে ক্লান্তভাবে কী যেন ভাবি—
হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি ;
আর শহরের রাস্তায় কখনো বা প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।
আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে-মাঝে বলি :
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।
কলতলায় ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙে
আর সমস্তক্ষণ রক্তে জলে
বণিক-সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

১৭০. নিরালা

বর্তমানে মুক্তকচ্ছ, ভবিষ্যৎ হোঁচটে ভরা,
মাঝে-মাঝে মনে হয়,
দুর্মুখ পৃথিবীকে পিছনে রেখে
তোমাকে নিয়ে কোথাও স'রে পড়ি।

নদীর উপরে যেখানে নীল আকাশ নামে
গভীর স্নেহে,
শেয়াল-সংকুল কোনো নির্জন গ্রামে
কুঁড়ে-ঘর বাঁধি ;
গোরুর দুধ, পোষা মুরগির ডিম, খেতের ধান ;
রাত্রে কান পেতে শোনা বাঁশবনে মশার গান ;
সেখানে দুপুরে শ্যাওলায় সবুজ পুকুরে
গোরুর মতো করুণ চোখ
বাংলার বধূ নামে ;
নিরালা কাল আপন মনে
পুরোনো বিষণ্ণতা হাওয়ায় বোনে।

১৭১. ঘরে বাইরে

তোমার ক্লান্ত উরুতে একদিন এসেছিলো
কামনার বিশাল ইশারা !
ট্যাঁকেতে টাকা নেই,
রঙিন গণিকার দিন হ'লো শেষ,
আজ জীবনের কুঁজ দেখি তোমার গর্ভে,
সেই দিন লুপ্ত হোক, যেদিন পুরুষ পৃথিবীতে আসে !
সময়ের চূর্ণ পাহাড়ে পিঙ্গল মানুষেরা মরে,
কর্কশ কাকের কণ্ঠে শুনি ধ্বংসের গান,
আর গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ
তোমাকে নিরন্তর কাপুরুষ প্রহার করে ;
সেইদিন লুপ্ত হোক যেদিন মানুষ পৃথিবীতে আসে।

কোনো নগরে একদিন যেন ছিলো
চারদিকে মেখলার মতো শালবনের অন্ধকার,
পাহাড়ের মতো মেঘবর্ণ প্রাসাদ, স্বয়ংবরা প্রেম ;

আর আজো তো আছে
কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম,
স্ফীতোদর দাম্ভিক স্বামীর পিছনে গর্ভবতী সতী সাবিত্রী,
আর বন্যার মতো পুত্রকন্যা, অরণ্যে রোদন ;
হে ঈশ্বর, এ কী অপরূপ !

অনুর্বর বালুর উপরে
কর্কশ কাকেরা করে ধ্বংসের গান।
কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম,
নারীধর্ষণের ইতিহাস
পেস্তাচেরা চোখ মেলে প্রতিদিন পড়া
দৈনিক পত্রিকায়।
আর মধ্য এশিয়ার মরুভূমি, নীল নির্জন সমুদ্র,
বিপুল পৃথিবী আর নিরবধি কাল !

তবু কিছুদূরে প্রখর রৌদ্রে ঘোরে
মহাযুদ্ধের ভগ্নদূত,
আর নীলরক্তবান নীলকর কবন্ধ মৃত্যু আনে।
জানি, রক্তহীন অন্তরে প্রতিদিন বারে-বারে আসে
ফুটবল-মাঠের চঞ্চলতা,
অষ্টপ্রহর কাঁপে
ভদ্রমহিলা দেখার তীব্র ব্যাকুলতা ;
আর মাঝে-মাঝে উদ্ভ্রান্ত যমদূত ক্লান্ত হতাশা আঁকে
দিন-রাত্রির নরকের সিংহদ্বারে।

তবু জানি, কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী
যুগে-যুগে নতুন জন্ম আনে,

তবু জানি,
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে,
ততদিন
ততদিন নারীধর্ষণের ইতিহাস
পেস্তাচেরা চোখ মেলে শেষহীন পড়া
অন্ধকূপে স্তব্ধ ইঁদুরের মতো,
ততদিন গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে
বণিকের মানদণ্ডের পিঙ্গল প্রহার।

১৭২. রোমন্থন

২
শূন্য মাঠে স্তব্ধ দিন।
যতদূর চোখ যায়, লৌহরেখা প্রসারিত
নির্বিকার অদৃষ্টরেখায়।

অন্নজলহীন মৃত্যু হয়তো,
ভবিষ্যতে হয়তো দুর্ভিক্ষ, চকিত প্লাবন।
তবু দেখি, ঝুড়ি-ঝুড়ি শাকসবজি, সহজ সবুজ,
সপ্তাহে দু-দিন গ্রাম্য হাট বসে,
বেচাকেনা সাঙ্গ হ'লে
হুঁকো-কলকে ঘন-ঘন হাত বদলায়,
মহাজন-চিন্তাহরা গন্ধ ছড়ায়।
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
অবোধ মন, বোঝানো ব্যর্থ।
পুত্রকন্যা এখনো আঙুলে গোনা যায়,
বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ,
তবু নিজেকে কতদিনের জীর্ণ বৃদ্ধ লাগে,

জিভে স্বাদ নেই, জানি না
কী পাপে সুস্থ শরীর ঘুণের আশ্রয়।
আমার অজ্ঞাতসারে
পুরাতন প্রগল্‌ভ দিনরাত্রি আসা-যাওয়া করে,
নদীর জোয়ারে, অন্ধকারে, তিলে-তিলে পৃথিবী মরে,
বুঝি, পিঙ্গল বালুচর সর্বভুক, অবিনশ্বর।

তাই দিনান্তে কলের বাঁশিতে
মনে হয় পৃথিবীর শেষ প্রান্তে
করাল শূন্যের বৃত্তে
নাভিচ্যুত শূন্য যেন কাঁদে
লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ
শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ।

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় (জ. ১৯১৬)

১৭৩. কোনো মৃত্যু-শিয়রে—আবহমান

এতদিন ধ'রে অঞ্চল ভ'রে যত গোধূলির আলো
কুড়োলে, সে-সব ঢালো এইবারে ঢালো।
ঝ'রে-পড়া যত মরা-মুহূর্ত-ফুল,
ঝেড়ে ফ্যালো লতা ক'রে ফ্যালো উন্মূল—
তোমাকে তো আমি বলেছি অনেকদিন
উদ্যত চির-মৃত্যুর সঙ্গিন,
মাটির স্বীকৃতি কালে মাটি হয়—এটা মনে রাখা ভালো।

যতদিন ধ'রে অঞ্চল ভ'রে যত গোধূলির আলো
নিয়েছো সে-সব ফ্যালো এইবারে ফ্যালো—
তোমাকে তো আমি বলেছি অনেকদিন

মৃত্যু রয়েছে অলক্ষ্যে, তার উত্তরী উড্ডীন।
শপথ স্বীকৃতি যা-কিছু মাটির সবই কালে হবে কালো—

এতকাল ধ'রে দেহখানি ভ'রে যত কাঁচাসোনা রোদ
নিয়েছিলে তার হবে আজ ঋণ শোধ
তোমাকে তো আমি বলেছি অনেকবার
কুসীদজীবিনী পৃথ্বীর সম্পদ,
রেখে যেতে হয় প্রতি কণাটিও তার
একের দিকেই একা দিতে হয় পাড়ি—
আমরা সবাই সব-কিছু পেয়ে সব-কিছুকেই ছাড়ি।
তুমি আজো আছো, পরেও থাকবে, তুমি ছিলে চিরদিন,
তুমি চ'লে গেলে প্রতীক্ষমাণ দেশ-কাল প'ড়ে থাকে,
নব ভাবে এসে শুধে যাবে ব'লে পুরোনো মাটির ঋণ
পুরোনো প্রথায় খেলাঘর পেতে পুরোনো পৃথিবী ডাকে।

বর্ষার মেঘে থাকবেই লেগে তোমার দেহের কণা
—এই কথা ভুলবো না।
নদীজলে গ'লে মিশে যাবে কোনো তোমার দেহের কণা
—এই কথা ভুলবো না।
যে-মাটিতে গাছ ফুল হ'য়ে ফোটে—তোমার দেহের কণা
—তার কথা ভুলবো না।
আকাশে-বাতাসে যে-ছাই ছড়াবে তোমার দেহের কণা
—তারও কথা ভুলবো না।
রৌদ্রের তেজে বৈদেহী কে যে তোমার দেহের কণা
—তারও কথা ভুলবো না।
ভুলবো না আমি তোমাকে, যে-তুমি পঞ্চের সমাহার,
পৃথিবীর চোখে উদ্বেল ক'রে প্রপঞ্চ-পারাবার
চ'লে যাবে তবু যাবে নাকো প্রকৃতই,
মরতা নিয়েই মরতাকে জয় ক'রে হবে অমৃতই।

যে-কথা রাখেনি তার জন্তেও
যে কথা রেখেছো তার জন্তেও
যে-বাধা মানোনি তার জন্তেও
যে-বাঁধ বেঁধেছো তার জন্তেও—
দুঃখেরও চেয়ে সূক্ষ্ম যে-ভাব তারই ছোঁয়া পেয়ে মন
উদাসীনতায় কী যে হ'য়ে যায়
শান্ত আবেগ হৃদয় ছাপায়,
জীবন পেরিয়ে উপনীত যার উদার উত্তরণ।

সময় তো নেই, বলবে কি কিছু? এই বেলা ব'লে ফ্যালো;
শুনছো? ডাকছে দিকের দেয়াল প্রতীক্ষারত, কালো।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (জ. ১৯১৭)

১৭৪. এই গাছ

এই বজ্রদগ্ধ গাছের শিরা বেয়ে
পৃথিবী একদিন ফুল হয়েছিলো, কখনো ফল,
কখনো সবুজ, কখনো সৌরভ।

শীতের সায়াহ্নে সে আজ দূরের নদী দেখছে,
যেখানে মৃতদেহের দগ্ধ হাড়, গুঁড়ো হাড়ের মতো বালি,
চাকার দাগ, যারা বেঁচে রইলো তাদের অশ্রু।

এই গাছ শুধু দেখছে:
নদীর ওপারের বন ছুঁয়ে চাঁদ উঠে এলো,
নটীর মতো নিটোল, চোখের নিচে কালি,
প্রথমে লাল, পরে শাদা, হাসপাতালের নার্সের মতো।

এই গাছ ভাবছে :
একদিন চৈত্রের ঝড়ে তার দেহ মর্মরিত ছিলো,
একদিন ভ্রমরের ভিড় ঘিরে ছিলো স্তাবকের মতো,
একদিন পৃথিবী তাকে ছুঁয়েছিলো—
আজ সে-পৃথিবী ভুলে গেছে।

স্তব্ধ রাত্রির মধ্য-আকাশে রুপালি-আগুন-লাগা চাঁদ,
শীতের শুকনো নদীতে কয়েকটা শেয়াল সন্তর্পণে ঘুরছে,
মাঝে-মাঝে পোড়া কাঠ আর গুঁড়ো হাড়ের মতো বালি
আর একটি বজ্রদগ্ধ গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে।

১৭৫. একা

তিন দিন তিন রাত্রি বৃষ্টির পর
ধবধবে রোদ্দুর।
শরতের নীল। মন যায় কদ্দুর!
তিন দিন তিন রাত্রির পর।
হয়তো কত দিন কেটে যাবে
মেঘ হবে পাহাড়ের চুড়ো
হয়তো কত দিন যাবে কেটে
তারা হবে পাহাড়ের ফুল
হয়তো কেটে যাবে কত দিন
কত শত দিন।

দাঁতে দাঁত চেপে
ট্রামের ভিড়ে চলেছো।
অনেক দিন পরে দেখা, কী এনেছো?
রায়বাহাদুর বাজার ক'রে বাহাদুরি কেনেন
সব-কিছু সঠিক চেনেন
চকচকে মরা ইলিশ থেকে আঁশটে জল ঝরে;

অনেক দিন পরে
দেখা। কী এনেছো ?
এক ঝাঁক রজনীগন্ধা ঐ লোকটার হাতে—
একটু জায়গা চাই ট্রামের পা-দানিতে।
পা মাড়ালো, জামা ছিঁড়লো তবু চলেছো।
আজকের হঠাৎ-উজ্জ্বল বিকেলে কী এনেছো ?

গান্ধীজী কি ম্যাজিক জানেন ?
স্বাধীন হ'য়ে কী পাচ্ছো, রণেন ?
মরা দেশ মরা মানুষ ফেলে পালালো ইংরেজ
গান্ধী-টুপি আর মুসলমানি ফেজ
স্টার্লিঙের দেনা
রাজকন্যের বিয়ের যৌতুকে দিয়েই দে না !
লাটের বাড়িতে স্বদেশী নিশেন
বুকটা কাঁপছে নাকি, রায়বাহাদুরি পেনসেন
হঠাৎ না ঘোচে
তিন দিন তিন রাত্রির পর সূর্য চোখ মোছে ;
হঠাৎ শরতের নীল
হিন্দু-মুস্লিম মিল
—উঃ, ভিড়টা কমলে বাঁচি
পকেটমারের কাঁচি
ইনফ্লুয়েঞ্জার হাঁচি
—তিন দিন তিন রাত্রির পর
হঠাৎ শাদা রোদ্দুর
টালিগঞ্জ কদ্দূর ?

কী এনেছে তিন দিন তিন রাত্রির পর
কী এনেছো ?
এনেছি শরতের খুশি, এনেছি আকাশের নীল।

(যত সব বাজে কথার ভুবি)
মিস্টার রায়ের নতুন স্টুডিবেকার
ল্যাণ্ড-ক্রুজার
আরতিকে নিয়ে তার স্বামী চলেছে আমেরিকা—
তিন দিন তিন রাত্রির পর

তারপর
কী এনেছো ? কী এনেছো ?
এনেছি শরতের খুশি, এনেছি রৌদ্রের শুভ্রতা—
কী সব ফাঁকা বুলির কাব্যিক কথা !

কিন্তু কী চাও ? কী চাও বলবে ?
সময়ের বালি ঝরবে, যৌবন মরবে,
সংসার চলবে।
আরো কী চাও বলবে ?

বিকেলের রোমান্টিক আড্ডার পিঠে বুদ্ধিজীবী সহিস
চিঁড়ে-ভাজা চা সহযোগে পিকাসো-মাতিস
কিংবা ফিফ্‌থ্‌ সিম্ফনি
মৃদু টিপ্পনি
বুঝেছো পলিটিক্যাল ফাঁকি
মিরাক্যল না হাতি, গান্ধী নেহাৎই লাকি
কলকাতা আশ্চর্য শহর .
ঠিক প্যারিসের পর।
হায়, জানি না প্যারিস কদ্দুর
এখানে নেহাৎই দেশী রোদ্দুর।

তিন দিন তিন রাত্রির পর
আর কী চাইবে ? কিংবা পাবে ?

অল্প-অল্প চিঁড়ে-ভাজা খাবে।
আলমারিতে ফরাশি বই।
ইনটেলেকচ্যুয়াল মই
মাঝে-মাঝে চেরি ব্র্যাণ্ডির ফাঁকে
কয়েকবার বিপ্লবের কথা হাঁকে
কিছুতেই কিছু হয় না
বাঁধা বুলির ময়না
আকাশের আশ্চর্য রোদ চোখে সয় না।

তিন দিন তিন রাত্রির পরের বিকেল শেষ হ'লো
আবার হাওয়া বইছে জোলো।
মেঘ জমছে
হয়তো বৃষ্টি নামবে
কণ্ট্রোলের ছাতাটা কই ?
আর পুরোনো বই—
ওই
ট্রাম চলেছে। সত্যিই মেঘ জমছে
সত্যিই বালি ঝরছে
রাত দশটার ট্রাম বেশ ফাঁকা
একা। ফিরছি একা।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (জ. ১৯১৭)

১৭৬ হে ললিতা, ফেরাও নয়ন !

হে ললিতা, ফেরাও নয়ন !
যদি শুভ্র শ্রীদেহের স্বাদ
আর নৈশ আশ্লেষ-শয়ন

মুক্তিস্নান এনেছে জীবনে,
দূরে থাক লোক-পরিবাদ।

জীবনের নাট্য-যবনিকা
প'ড়ে যাবে, মনে রাখো নাকি?
মুছে গেলে জীবন্ত জীবিকা
কী করিবে তখন একাকী?
শুধু চোখে ক্লান্ত গতভাষ!

হৃদয়ের ব্যাকুল শ্বাপদ
খুঁজে ফেরে আরক্ত শিকার,
কান পেতে স্থির হ'য়ে শোনে
পক্ষধ্বনি শত বলাকার।
ঘুম নাই নিদ্রালু নয়নে।

উতরোল নিবিড় রজনী।
খোলো রক্ত লাজ-আবরণ,
লজ্জা-অপমান শঙ্কা ছাড়ো!
শোনো মোর ধমনীর ধ্বনি,
আগে রাখো মানুষের মন!

উপরেতে আকাশ ছড়ানো,
নিচে কাঁপে মদালস বায়ু,
হে ললিতা, কাছে এসো, শোনো—
হিমসিক্ত তোমার চুম্বনে
শেষ হবে মোর পরমায়ু!

অদূরেতে কৃষ্ণ মৃত্যু কাঁপে,
তবু যেন তৃণের মতন
ভেসে চলি অন্তিম বিপাকে,

আকাঙ্ক্ষায় শুব্ধ অচেতন,
মৃত্যু আনে নৈশ পরিশ্লেষ।

তাণ্ডবের দীর্ঘশ্বাস শুনে
আছিলাম ঘোর অচেতন,
আকাঙ্ক্ষার জাল বুনে-বুনে
এইবার হয়েছে উধাও
বক্ষোমাঝে উদ্ধত নয়ন।

এই লহো মোর দুই হাত।
অতীতের সাধনায় বুঝি
আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু-বরাভয়
লভিয়াছি দেহপ্রান্ত খুঁজি!
ক্লান্ত তনু সুন্দর অক্ষয়।

১৭৭. দিনযাপন

(অংশ)

কী তবে আমার কাজ : অবিরাম উত্থানপতনে
বিদীর্ণ কল্পান্ত কাঁপে, মধ্যবিত্ত ছা-পোষা মানুষ
আরো অনেকের মতো আমিও ছুটেছি প্রাণপণে
নারী, স্বর্ণ, গান নয়, লুপ্তপ্রায় স্বস্তির সন্ধানে
পথে মাঠে তেপান্তরে ; পথকষ্টে প্রায় দীর্ণপ্রাণ ;
তবুও দুর্মর আশা মুহূর্তেই আনে চঞ্চলতা
বিধ্বস্ত প্রাণের পাত্রে,—বারংবার তীব্র আস্বাদান
করার সংকল্প নিয়ে ফিরে আসি ; প্রাণের শূন্যতা
ভরে না সংকল্পে শুধু ; অন্ধকারে যেদিকে তাকাই
নিষ্ফল জোনাকি ছাড়া অন্য কোনো আলোর মশাল
রিক্ত প্রাণে আনে না আশ্বাস ; সন্ধ্যাকালে বাড়ি ফিরে
বারান্দার কোণে ব'সে আকাশের নীল তারা গুনে

কিছুটা সময় কাটে। কখনো বা রোগীর শিয়রে
ব'সে-ব'সে নানা কথা ভাবি তার পরিচর্যাকালে
জন্ম-মৃত্যু-ভবিষ্যৎ নিয়ে। চন্দ্রালোকে ঘর ভরে
সহসা নিথর রাতে। কোথায় দু-হাতে স্নিগ্ধ ফুল
ছড়ায় আঘ্রাণ বনতলে; মত্ত বাতাসের ঢেউ
মুখে-চোখে বেগে লাগে, মনে পড়ে এদিনেও কেউ
দূরের মাঠের পথে বাড়ি ফেরে শিস দিতে-দিতে
জ্যোৎস্নায় হাওয়ায় মুখ রেখে; কালো দীর্ঘ এলোচুল
তারই বউ চেয়ে ছাখে দূর মাঠে যেখানে শিমুল
দাঁড়ায় প্রাণের জোরে আকাশের দিকে ডানা মেলে
পরিপূর্ণ প্রতীক্ষায়; মেঘলোকে নিভৃত পাখায়
বালুহাঁস উড়ে যায় জ্যোৎস্নামত্ত অজ্ঞাতযাত্রায়
অনুমিত অগ্রণীর অদৃশ্য সংকেতে। আর আমি
তন্দ্রাভাঙা শেষরাত্রে গলিপথে হরিধ্বনি শুনে
চমকে স্বরাজ্যে ফিরি, কল্পনার পাখা ছিন্ন ক'রে
শ্মশানযাত্রীর ধ্বনি হেঁকে যায় দূর থেকে দূরে।

কী তবে আমার কাজ: আমি জানি, বাঁচে না মানুষ
স্মৃতিকে সম্বল ক'রে; কল্পনার অনিত্য ফানুস
উড়িয়েও শেষরক্ষা হয়নি কখনো কোনো কালে।
শুধু গতি, দুরন্ত দুর্বার বেগে একটি পদ্ধতি
সৃষ্টির গোপন মূলে কাজ করে,—যোগসূত্রহীন
আমরা তলিয়ে যাই সমুত্থিত ঢেউয়ের আড়ালে
বন্যাছাড়া ঝোড়ো দিনে, ব্যর্থকাম, থাকি রুদ্ধরতি,
জোয়ারের তীব্র টানে অনিবার্য হয় অধোগতি।
আজো তাই ক্রুদ্ধ বন্যাছাড়া দিনে দিগন্তে তাকিয়ে
নিশ্চিত আশ্বাস খুঁজে বারংবার রুদ্ধশ্বাস শ্রমে
স্তিমিত শরীর কাঁপে; ইউরোপে এশিয়ায় হানে
ক্রান্তি তার ক্রুদ্ধ বর্শা, কল্পান্তের নক্ষত্রসন্ধানে

দিগন্ত খণ্ডিত করে ; আর আমি আবদ্ধ নগরে
আপন কর্তব্য খুঁজে নিদ্রাহীন রাত্রি যাপি ঘরে
বেদনাবিহ্বল ক্ষণে ; বহুদূরে শোনা যায় যেন
গর্জনে উচ্ছ্বাসে জাগে অন্ধকারে সমুদ্র সফেন,
অনিষ্ট প্লাবনবেগ ; কারা দৃঢ় পদক্ষেপে বেগে
সমুখে এগোয় পথে রাত্রিশেষে মরীয়া আবেগে
দীর্ঘ দৃপ্ত অভিযানে ; সে-গতির তাপ ভগ্ন মনে
অকৃত্রিম অভিজ্ঞান সৃষ্টি করে যুগসন্ধিক্ষণে।

হরপ্রসাদ মিত্র (জ. ১৯১৭)

১৭৮. নিকট বালি, দূর জল

নানা মানুষ জমে, জমায় নানান কথার বেসাতি।
সেই হাটে এই নিত্য ভ্রমণ কখন-যে রয় কে সাথী!
কেউ বলে, ঠিক,—কেউ বলে, ভুল,—কেউ বলে, হ্যাঁ, তা বটে।
কোথায় নদী বেঁকবে কখন,—তারপরে যে কী ঘটে
মনের মধ্যে সেই কথাটাই উঠছে-পড়ছে নিরন্তর
বর্তমানই অন্ধ-চেনা, ভবিষ্যৎ তো দিগন্তর!

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, বিষ্টি এলো কোন দেশে—
কী জানি কোন গাছের ছায়া একটি নদীর কোল ঘেঁষে!
মাটিতে জল, আকাশে মেঘ,—হঠাৎ কেমন অন্ধকার।
এদিকে এই আপিশ-ফেরৎ ভাঁটির ত্বরা,—ছন্দ তার
অধরা রয়, পোষ মানে না প্রাচীনপন্থী পদ্যেতে।
বস্তুবোধের কনুই লাগে হঠাৎ বুকের মধ্যেতে।

বৃহৎ পরিবহণ, বিপুল চলাচলের গর্জনে
শরীরটাকে সামলে চলার ক্ষিপ্রকলা অর্জনে
মন জেগে রয়, লক্ষ্য থাকে চেনা বাড়ির প্রতীক্ষায়।
প্রতিবেশের নগদ দাবি মিটিয়ে অন্য সমীক্ষায়।

দেবার মতো মনের মধ্যে থাকে না মন কিঞ্চিৎ-ও।
পিণ্ডপ্রমাণ এই পরিমেল সূক্ষ্ম মানসবঞ্চিত।

প্রতিবচন, পুনর্বচন—শূন্য হৃদয় চলন্ত,—
দু-পারে তার কমলারঙের বৈকালী রোদ পড়ন্ত।
ঠেলাগাড়ির দোলন-লাগা শিশুর চোখে এ-সংসার
প্রশ্নবিহীন প্রাপ্তি শুধুই, নেইকো কাঁটা সমস্যার।
অথচ ঠিক পাশেই আছে যে-জরতী স্তব্ধতা—
বিক্ষত সে। কেবল বোঝা। শুষ্কতা আর রুক্ষতা।

বিদ্যুদ্বেগ—নিকটবৃত্ত—চেনা মহল নিরুৎসুক।
দিন কেটে যায় স্বল্পচেতন,—এমন সময় অসীম সুখ
কী ঝর্ঝর নামলো মনে—আর-এক ছায়ায় নদীর ঘাট,
আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, বালির চরে পাখির হাট।
সবুজ শাড়ির ভঙ্গিমা, সে কী আশ্চর্য অনুপ্রাস
অনেক যোজন বালির পরে পাহাড়ি জল, চিকন ঘাস!

গোপাল ভৌমিক (জ. ১৯১৮)

১৭৯. দুঃসাহসী নাবিকের গান

মনে ছিলো মানচিত্র
ভূগোলেও ছিলো নাকো ভুল :
দিকদর্শনের যন্ত্রে
দেখে নিয়ে কোন দিকে কূল
যাত্রা শুরু হয়েছিলো
অজানা এ-সমুদ্রের বুকে ;
অনেক আশ্বাসে ভরা

রাত্রির সম্মুখে
ছিলো সূর্য-সম্ভাবনা,
আকাশে অজস্র তারা-ফুল
হাতছানি-দিয়ে-ডাকা ছায়া-পথে
মায়ার মুকুল।

যাত্রাকালে কিন্তু দিক্‌শূল
ছাড়েনি আমার পিছু,
বুঝেছি তা অনেক দেরিতে
যখন অনেক-কিছু
ক্ষয়-ক্ষতি দিয়ে
এ-জাহাজ পায়নিকো কূলের নিশানা,
অজানা চড়ায় ঠেকে
বন্দরের হারালো ঠিকানা।

দুঃসময় যে-ই দিলো হানা
দুরন্ত দস্যুর মতো,
আমি কিন্তু এতটুকু
হইনি বিব্রত
জানি আমি বিজ্ঞানীরও
গণনায় মাঝে-মাঝে ভুল
হ'তে পারে; তাই ব'লে
সৃষ্টির মুকুল
চিরদিন ঝ'রে যাবে অন্ধকারে
কিংবা বন্ধ্যা বালুচরে
তাও আমি মানি না কিছুতে :
আমি যদি না-ও পারি, আর কেউ শক্ত হাতে ধ'রে
এ-জাহাজ নিয়ে যাবে সমুদ্রের পারে
অতি দূর আলোর বন্দরে।

মণীন্দ্র রায় (জ. ১৯১৯)

১৮০. অতিক্রান্তি

যখন কেবলি মানসকামনা
সরাতো বুকের লঘু পাহাড়,
ষড়জে-নিখাদে এঁকেছি কত-না
আত্মরতির সুর-বিহার।

রাগমালা সেই মনের আকাশে
বর্ষণভীরু বলাকামেঘ,
হালকা সাঁতারে আসে যায় আসে
প্রথম প্রেমের মতো আবেগ।

নব ফাল্গুনে কখনো বা তার
সাড়ায় কেঁপেছে নতুন পাতা,
ভুঁইচাঁপা খোলে চকিত দুয়ার,
দিঘি ভ'রে ঢেউয়ে নীলের খাতা।

শুধু ঐটুকু, তার বেশি নয়
একস্বরে সাধা সেই রাগিণী
কখনো গোপনে খুঁজেছে প্রণয়,
কখনো বা সাজে বৈরাগিণী।

সে-আকাশে আজ বজ্রের দাহ
এলো বিদ্যুৎজ্বালা বৈশাখ,
সে-মেঘে তরল অগ্নিপ্রবাহ,
সে-গানে রুদ্র মত্তপিনাক।

হৃদয়ের বাঁধ ভেঙে খানখান,
মনের মিনারে ন'ড়ে ওঠে ভিত,

সুরের ঘূর্ণি প্রলয়ের বান
আনে পাতালের এ কী সংগীত!

ভাষার পরিধি ছিঁড়ে উড়ে যায়,
খনিজ বিস্ফোরণের আখরে
জ্ব'লে ওঠে মন ধাতব আভায়,
রক্তে গতির বর্ণালি ঝরে।

এ-গান আমার অভিজ্ঞতার
জীবকোষে অনুস্বপ্নকণায়
ফসফরাস-এর শত দীপাধার
জ্বালে সমুদ্র ঢেউয়ের ফণায়।

ফেটে পড়ে আজ এই সুর বুঝি!
কাঁপে মনে সূর্যাগ্নির স্তব।
এলো কি মুক্তি! রঙে-রঙে মুছি
রাত্রি, উষার এ কী বিপ্লব!

১৮১. ভোরের স্বপ্ন

দেখ তমস্বিনী মেলেছে চোখ
হেমকান্তি ঐ মেঘসমাজে!
আজ সূর্যোদয় মধুর হোক,
জাগে স্বপ্ন যেন দিনের কাজে।

এসো রাত্রিশেষে ঘোমটা খুলে,
কর্মঘন আশা দু-চোখে জ্বালো,
শ্রমবিন্দু-ঘেরা কপালে চুলে
মুখশ্রী তোমার মানাবে ভালো।

যদি দীর্ঘ পথে কাতর হই
ক্লান্তি নামে এই অন্বেষণে,
পাবো যৌবনের মরণজয়ী
স্বপ্ন, আহা, ঐ হৃদয়-মনে।

তুমি বৃন্ত যেন, পাপড়ি আমি।
দীপ্ত শিখা তুমি, আমি আধার।
দুটি পক্ষ একই আকাশগামী,
দুটি পংক্তি মিলে একই পয়ার।

মুক্তি-খোঁজা দিনে প্রেয়সী তাই
ডাকি কণ্টকিত প্রেমের পথে।
তুমি সঙ্গী হ'লে কাকে ডরাই,
স্বর্গ জেগে ওঠে এই ধুলোতে।

বাণী রায় (জ ১৯১৯)

১৮২. এলিজি

মৃত্যুরে দেখেছি আমি শ্বাপদের রূপে।
মৃত্যু বার-বার জীবনের উপহার
করেছে হরণ।
দেখেছি নির্লজ্জ সেই বুভুক্ষু মরণ।
বিকশিত জীবনের দল
নিষ্ঠুর নখরাঘাতে বিধ্বস্ত লুণ্ঠিত।
শিশুর শিয়রে তার ভয়াল প্রহরা ;
যৌবনের শয্যাতলে মৃত্যুর কণ্টক।
স্তব্ধ-ভীত আঁখি মেলি' দেখেছি মরণ
আশ্বাস-বিশ্বাস নিত্য করেছে হরণ।

তোমার কুন্তল কালো,
আরো কালো চোখ,
বিনাহেতু লজ্জানত চোখের পলক।
আইভরি-ম্লান ভালে কুঙ্কুমের টিপ,
আরক্ত অধর দুটি প্রবালের দ্বীপ,
মানস মুকুতা ঝরে চিত্ত-উর্মি থেকে,
বঙ্কিম কটাক্ষ যায় বাঞ্ছিতেরে দেখে।
,—মোহিনী কিশোরী তুমি।
তোমারও শিয়রে দেখিলাম কালো দুটি বাদুড়ের পাখা,
গৃধিনীর লুব্ধ নখ।
মর্মর ফলক তোমার বুকের বেদী ;
ফুটিলো গোলাপ,
মৃত্যুর রক্তিম পুষ্প, লুব্ধ নখাঘাতে।
কালো চুলে জলে আলো তবু ক্ষণে-ক্ষণে।
সজাগ প্রহরী সে তো বেহুলা-বাসরে।
ক্লান্ত সুপ্ত সেবীদল ; নিতন্দ্র প্রদীপ ;
জলে প্রদীপের তলে প্রবালের দ্বীপ
মধুর বঙ্কিম হাস্যে।
সে কি উপহাস ?
কালের কবলশূন্য আজো দেহতট,
পেলো না কালের ছোঁয়া
—তাই এত হাসি ?

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (জ. ১৯২০)

১৮৩. প্রস্তাব

প্রভু, যদি বলো, অমুক রাজার সাথে লড়াই
কোনো দ্বিরুক্তি করবো না ; নেবো তীর-ধনুক।

এমনি বেকার ; মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই ;
দেহ না-চললে, চলবে তোমার কড়া চাবুক।

হা-ঘরে আমরা! মুক্ত আকাশ, ঘর, বাহির।
হে প্রভু, তুমিই শেখালে, পৃথিবী মায়া কেবল—
তাই তো আজকে নিয়েছি মন্ত্র উপবাসীর ;
ফলে নেই লোভ ; তোমার গোলায় তুমি ফসল।

হে সওদাগর,—সেপাই, সান্ত্রী সব তোমার।
দয়া ক'রে শুধু মহামানবের বুলি ছড়াও—
তারপরে, প্রভু, বিধির করুণা আছে অপার।
জনগণমতে বিধিনিষেধের বেড়ি পরাও।

অস্ত্র মেলেনি এতদিন ; তাই ভেঁজেছি তান।
অভ্যাস ছিলো তীর-ধনুকের ছেলেবেলায়।
শত্রুপক্ষ যদি আচমকা ছোঁড়ে কামান—
বলবো, বৎস! সভ্যতা যেন থাকে বজায়।

চোখ বুঁজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাবো কান।

১৮৪. বন্ধু

গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো
পুরোনো সুর ফেরিওলার ডাকে,
দূরে বেতার বিছায় কোন মায়া
গ্যাসের আলো-জ্বালা এ-দিনশেষে।
কাছেই পথে জলের কলে, সখা
কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে,
হঠাৎ গ্রাম হৃদয়ে দিলো হানা
পড়লো মনে, খাসা জীবন সেথা।

সারা দুপুর দিঘির কালো জলে
গভীর বন দু-ধারে ফেলে ছায়া
ছিপে সে-ছায়া মাথায় করো যদি
পেতেও পারো কাৎলা মাছ, প্রিয়।
কিংবা দোঁহে উদার বাঁধা ঘাটে
অঙ্গে দেবো গেরুয়া বাস টেনে
দেখবে কেউ নখ, বা কেউ জটা
কানাকড়িও কুঁড়েয় যাবে ফেলে।

পাষাণ-কায়া, হায়রে, রাজধানী
মাশুল বিনা স্বদেশে দাও ছেড়ে;
তেজারতির মতন কিছু পুঁজি
সঙ্গে দাও, পাবে দ্বিগুণ ফিরে।
ছাদের পারে হেথাও চাঁদ ওঠে—
দ্বারের ফাঁকে দেখতে পাই যেন
আসছে লাঠি উঁচিয়ে পেশোয়ারি
—ব্যাকুল খিল সজোরে দিই তুলে

ইহার মাঝে কখন প্রিয়তম
উধাও; লোকলোচন উঁকি মারে—
সবার মাঝে একলা ফিরি আমি
—লেকের কোলে মরণ যেন ভালো।
বুঝেছি কাঁদা হেথায় বৃথা; তাই
কাছেই পথে জলের কলে, সখা,
কলসি কাঁখে চলছি মৃদু চালে,
গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো।

১৮৫. নির্বাচনিক

ফাল্গুন অথবা চৈত্রে বাতাসেরা দিক বদলাবে
কথোপকথনে মুগ্ধ হবে দুটি পার্শ্ববর্তী সিঁড়ি,—

"অবশ্যকর্তব্য নীড় ।" (মড়া-কাটা-ঘর,—স্থানাভাবে ?)

নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী ; ট্যাঁকে টুকরো অর্ধদগ্ধ বিড়ি ।
মাংসের ছুর্ভিক্ষ নইলে ঋষি মনে হ'তো হাবেভাবে ।
বিকৃতমস্তিষ্ক চাঁদ উল্লাঙ্গুল স্বপ্নে অশরীরী ।

বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ ।
মন্দভাগ্য বার্সিলোনা রেস্তোরাঁতে মন্দ লাগবে না ।
সাম্য অতি খাসা চিজ !—অনুচিত কিন্তু রাজদ্রোহ !

"জীবন বিস্বাদ লাগে !"—ইত্যাদিতে ইতস্তত দেনা ।
এবার আত্মাকে, বন্ধু, করা যাক প্রত্যাহার । (অহো !
সম্প্রতি মাঘের দ্বন্দ্বে ছত্রভঙ্গ দক্ষিণের সেনা ।

সদলে বসন্ত তাও পদত্যাগ-পত্র পাঠাবে না ?)

১৮৬. কিংবদন্তী

চলছিলো এতকাল বেসাতি
নিরাপদে বেশ এ-দাস দেশে ।
আজকে ঢেউয়ের অলিগলিতে
যমদূত দেয় ডুবসাঁতার ।
আদার ব্যাপারি, তাই বুঝি না
জাহাজের হালচাল কিছুই ।
কেবল গ্রাম্য হাটবাজারে
ভেসে আসে কানে ক্ষীণ গুজব ।

১৮৭. একটি কবিতার জন্য

একটি কবিতা লেখা হবে । তার জন্তে
আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ
রাগে রী-রী করে, সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে
ছুরন্ত ঝড়, মেঘের ধূম্র জটা

খুলে-খুলে পড়ে, বজ্রের হাঁকডাকে
অরণ্যে সাড়া, শিকড়ে-শিকড়ে
পতনের ভয় মাথা খুঁড়ে মরে
বিদ্যুৎ ফিরে তাকায়
সে-আলোয় সারা তল্লাট জুড়ে
রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে
ভস্মলোচন।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে।

একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে
দেয়ালে-দেয়ালে এঁটে দেয় কারা
অনাগত একদিনের ফতোয়া,
মৃত্যুভয়কে ফাঁসিতে লটকে দিয়ে
মিছিল এগোয়
আকাশ-বাতাস মুখরিত গানে,
গর্জনে তার
নখদর্পণে আঁকা
নতুন পৃথিবী, অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালোবাসা।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জ. ১৯২০)

১৮৮. মুখোশ

কান্নাকে শরীরে নিয়ে যারা রাত জাগে,
রাত্রির লেপের নিচে কান্নার শরীর নিয়ে করে যারা খেলা,
পৃথিবীর সেই সব যুবক-যুবতী
রোজ ভোরবেলা
ঘরে কিংবা রেস্তোরাঁয় চা দিয়ে বিস্কুট খেতে-খেতে
হঠাৎ আকাশে ছোঁড়ে দু-চারটি কল্পনার ঢেলা :

এবং হাজারে কয় রান ক'রে আউট হ'য়ে গেছে
ভুলে গিয়ে তারা হয় হঠাৎ অদ্ভুত।
যুবতীকে মনে হয়, হয়তো বা সেরে গেছে সকল অসুখ,
যুবককে মনে হয়, কোনো-এক রহস্যের দূত
কার যেন স্মৃতিমুখ পাঠায়েছে আমাদের মতো কোন প্রণয়ীর কাছে ;
সুন্দর কি কুৎসিত জানি না, তবু জানি মার্চেণ্টের মারে নেই এই সব খুঁত।

কান্নাকে সরিয়ে রেখে দৈনিক কাগজ খুঁজি তাই,
যুবককে ভুলে যাই, যুবতীকে দূরে-দূরে রাখি ;
তারপর কোনোদিন যদি মনে হয়
দিনগুলি বাসি বড়ো, বিবর্ণ, একাকী,
প্রেমিক কি উদ্বাস্তর মতো এক সমস্যায় নিতান্তই মূর্খ হ'য়ে গেছে :
আমার কী আসে যায়, তুড়ি মেরে এগজামিনে দিয়ে যাবো ফাঁকি !

অথবা কবিতা দিয়ে সমর্থন জানাবো তোমাকে,
হে প্রেমিক, হে উদ্বাস্তু, তোমাদের দুঃখে আমি গ'লে হবো নদী !

হে দিন, হে কালরাত্রি,
না-হয় আগলাবো আমি তোমাদের দুর্দিনের গলি।
তোমরা নির্বোধ হাতে স্মৃতিমুখ খুঁজে-খুঁজে প'ড়ে যাবে যখন অসুখে,
তোমাদের দুঃখে আমি ম'রে যেতে রাজি আছি—কারো দুঃখে মরা যায় যদি।
কী আশ্চর্য ! সেই ছেলে আমার দর্শন শুনে তবু
অর্ধেক বিস্কুট ফেলে রেস্টোর‍্যাণ্ট থেকে
চ'লে গেলো। সেই মেয়ে সিনেমার বিজ্ঞাপনে ভিড়ে
ডুবে গেলো, তারপর কী যেন বললো সঙ্গিনীকে।
মনে হ'লো হেমিংওয়ে মম্ নিয়ে ওদের বিবাদ
আজন্ম চলেছে যেন, বন্ধুত্বটা কোনোমতে আছে তবু টিকে !
হঠাৎ পড়লো চোখে কাগজের এডিটরিয়াল,
আমেরিকা ভালো, চীন ভালো…

টম্যান পাঠাবে অন্ন আমাদের কাল :
হৃদয় জুড়ালো।

হে যুবক, হে যুবতী, পৃথিবীতে তোমাদের কতটুকু দাম ?
কান্নাকে শরীরে নিয়ে কার ঘরে কয় ফোঁটা দিয়ে গেলে আলো ?

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (জ. ১৯২১)

১৮৯. আমার ভালোবাসা

আমার দিনমান আপন মনে শুধু মনের পথ হাঁটা
আমার সারা রাত মনের তারাভরা আকাশে তারা গোনা
এমনই লোকে লোকারণ্য সংসার, আমি ছিলাম একা,
ঘরের কোণে ছিলো একটি মুখ সে-ই আমার ভালোবাসা।

মনের অন্দরে বন্দী পাখি ও যে থাকতো চোখে-চোখে
নিজেকে ঠুকরিয়ে নিজেকে নিয়ে বড়ো ব্যস্ত—মুখে-মুখে
গোপন জানাজানি আমাতে-ওতে শুধু, শুধু আমাতে-ওতে,
ঘোমটা-টানা মুখ ঘরের কোণে সে-ই আমার ভালোবাসা।

সূর্য বার-বার দিতেছে হানা : দিন দগ্ধ পথরেখা
হৃদয় ফেরি ক'রে ফিরেছে দোরে রাত উতল তারাহারা
আকাশ ফিরে গেছে বাতাস হাহাকার হেঁকেছে এসো, এসো,
ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে তবু সে-ই আমার ভালোবাসা।

আজ কি হাহাকার হাজার হাতে তার ভেঙেছে খিল—আসে
প্রবল কলরব বন্যা বাঁধভাঙা বাহিরে করে আসে
হাসির হলকায় দমকা অভিমানে হাওয়ায় দিশাহারা
ঘোমটা খ'সে গেছে তুলেছে মুখ সে-ই আমার ভালোবাসা।

আ মরি ! আজ বুঝি সারাটা সংসার মুখেরই সমারোহ
যেদিকে চাই মুখ স্নিগ্ধ ধারাস্নান মুগ্ধ দক্ষিণা
যেদিকে যাই মুখ শান্ত নীলাকাশ মাটির শ্যামলিমা
ঘোমটা-খসা মুখ তুলেছে তার সে-ই আমার ভালোবাসা ।

আ মরি ! সেই মুখ কখন চাপা ঠোঁটে চণ্ড বৈশাখী
দীপ্ত বিদ্যুৎচমক দুই চোখে—ঝড়ের নাগিনী সে
ফুঁসছে এলোচুলে ক্রুদ্ধ কালো মেঘ হৃদয়ে দুন্দুভি
সারাটা সংসার একটি মুখ সে-ই আমার ভালোবাসা ।

অরুণকুমার সরকার (জ ১৯২২

১৯০. জন্মদিনে

(শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসুকে)

সিন্দুক নেই ; স্বর্ণ আনিনি,
এনেছি ভিক্ষালব্ধ ধান্য ।
ও-দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাবো কি পরশ যৎসামান্য ?

দুরাশা আমার সীমাহীন বটে
তবুও কী জানি দৈবে কী ঘটে ।
দ্বিধাবিজড়িত লজ্জাপীড়িত
এ-হৃদয় ঝাউবৃক্ষের পাতা,—
যার জানালায় দু-বাহু বাড়ায়
নেই সেই জন ঘরে অবশ্য ।

এই তো সেদিন সারা প্রান্তরে
সময়ের সোনা দূরবিস্তৃত ।...

হায় রে, কখন কেটেছে সকাল,
দুপুর ছুঁয়েছে বিকেলের লাল ;
তারার আলোতে ভেসে গেছে স্রোতে
গানের প্রাণের হিজিবিজি খাতা।
আজ মাঝরাতে নেই বিছানাতে
ঘুমের মাঠের সবুজ শস্য।

মাথা পেতে তবে মেনে নিতে হবে
শাদা আরশির নিরেট ব্যঙ্গ ?
যে-কুসুমগুলি মেখেছিলো ধূলি
তা-ও কি পাবে না তোমার সঙ্গ ?
স্মৃতি থেকে তাই এনেছি দু-মুঠো
গন্ধমদির আমন ধান্য।
ও-দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাবো কি পরশ যৎসামান্য ?

১৯১. বৈশাখী

তোমাকে চাই আমি, তোমাকে চাই,
তোমাকে ছাড়া নেই, শান্তি নেই :
রক্তকিংশুকে জ্বালিয়ে দাও
আমার বৈশাখী রাত্রিদিন।

রভসে দাউদাউ সমুদ্রের
শরীরে পাকে-পাকে ফসফরাস ;
অন্ধকারে চুল এলিয়ে দাও
নখরে নীল হোক শুভ্র বুক।

তোমাকে চাই আমি, তোমাকে চাই :
হেঁকেছে অস্থির অশ্বখুর ;
জ্বলেছে পদে-পদে বিদ্যুতের
তীব্র শব্দের আর্তনাদ।

তোমাকে ছাড়া নেই, শান্তি নেই,
গোলাপফুল আমি ছুঁয়েছি ঢের ;
রক্তকিংশুকে জ্বালিয়ে দাও
আমার বৈশাখী রাত্রিদিন।

১৯২. প্রার্থনা

যদি ম'রে যাই
ফুল হয়ে যেন ঝ'রে যাই ;
যে-ফুলের নেই কোনো ফল
যে-ফুলের গন্ধই সম্বল ;
যে-গন্ধের আয়ু একদিন
উতরোল রাত্রিতে বিলীন ;
যেই রাত্রি তোমারই দখলে
আমার সর্বস্ব নিয়ে জ্বলে,
আমার সত্তাকে ক'রে ছাই।
ফুল হ'য়ে যেন' ঝ'রে যাই।

১৯৩. জার্নাল থেকে

বৃষ্টিভেজা বাড়ির মতো রহস্যময়
তোমার হাতে আছে আমার একটু সময়
কত দিনের কত রাতের ঝাপসা তুলির
রঙে রেখায় আঁকা আমার একটু সময়।

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী (জ ১৯২২)

১৯৪. আরশি-নগর

আরশি-নগরে পড়শি বসত করে।
ধান ভেসে গেছে, মানুষ মড়কে মরে।

লতাপাতা জামা, চিত্রিত দুটি ভুরু,
সূর্য হাসায় গুপুরির গরিমাকে ;
শাঁখের শব্দে আলিপুরে ফেরে হাঁস,
পড়শি আমার উঠলো পটিয়াকে।
(৬-২৯) মনুমেণ্টের নিচে
জনসভা তাকে ডাকে।

ডুবে গেছে কত শান্তির সংসার।
ত্রস্ত গোরুর দুটি চোখ দেখে ভয়,
ধ'রে আছে লোকে উঁচু বাড়িটির চুড়ো,
সাহায্য দরকার।

জলে ভাসে ঘর— সান্ত্বনা দরকার।
কাপড় অন্ন নিয়ে উড়ে যায় প্লেন,
তারায়-তারায় অনন্ত শাদা রোদ,
শুনতে পারিনে আর।

গণক প্রেমিক ভিক্ষুকে গুলজার
রূপসী শহর— কোথায় আরশি তার ?

নরেশ গুহ (জ. ১৯২৪)

১৯৫. শান্তিনিকেতনে ছুটি

দূরে এসে ভয়ে থাকি : সে হয়তো এসে ব'সে আছে।
হয়তো পায়নি ডেকে, একা ঘরে জানালার কাচে
বৃষ্টির বর্ণনা শুনে ভুলে গেছে এটা কোন সাল।
ভুলে গেছে জীবনের দরিদ্র ধীবর আর জাল
জোড়া দিতে পারবে না। যদি দেয়, তবু ক্ষীণ হাতে
সেই ধূর্ত মাছটাকে পারবে না ডাঙায় ওঠাতে।

পারলেও অভিজ্ঞান সে-অঙ্গুরী হয়তো বা ফিরে
পাবে না কখনো তার শীতল পিচ্ছিল পেট চিরে।
যদি পায়?
যদি তার এতকাল পরে মনে হয়
—দেরি হোক, যায়নি সময়?

শান্তিনিকেতনে বৃষ্টি : ছুটি শেষ। ভিজে আলতা-লাল
শূন্য পথ। ডাকঘরে বিমুখ কাউণ্টর চুপ। কাল
হয়তো রোদ্দুর হবে, শুকোবে খোয়াই, ভিজে ঘাস।
লোহার গরাদ-ঘেরা আম্রকুঞ্জে কবিতার ক্লাশ
কাল থেকে ফের। ঘুমে ফোলা চোখ, ভাঙা-ভাঙা গলা,
কবে সে মন্থর পায়ে পাতা-ঝরা ছাতিমতলায়
একা এসে ঘুরে গেছে? ঘণ্টা গুনে হঠাৎ কখন
অকারণে দিন গেলো। ছায়াচ্ছন্ন শান্তিনিকেতন।

কলকাতায় ফিরে যদি—যদি আজ বিকেলের ডাকে
তার কোনো চিঠি পাই? যদি সে নিজেই এসে থাকে?

১৯৬. রুমির ইচ্ছা

আমি যদি হই ফুল, হই ঝুঁটি-বুলবুল হাঁস
মৌমাছি হই একরাশ,
তবে আমি উড়ে যাই, বাড়ি ছেড়ে দূরে যাই,
ছেড়ে যাই ধারাপাত, দুপুরের ভূগোলের ক্লাশ।

তবে আমি টুপটুপ নীল হ্রদে দিই ডুব রোজ
পায় না আমার কেউ খোঁজ।
তবে আমি উড়ে-উড়ে ফুলেদের পাড়া ঘুরে
মধু এনে দিই এক ভোজ।

হোক আমার এলোচুল, তবু আমি হই ফুল লাল
ভ'রে দিই ডালিমের ডাল।
ঘড়িতে দুপুর বাজে, বাবা ডুবে যান কাজে,
তবু আর ফুরোয় না আমার সকাল।

১৯৭. মাঘ শেষ হ'য়ে আসে

মাঘ শেষ হ'য়ে আসে,
ভোর হ'লো হিমে নীল রাত।
আলোর আকাশগঙ্গা ঢালে কত উল্কার প্রপাত।
আনত ওষ্ঠের তাপ বসন্তের প্রথম হাওয়ায়।
তবু ক্লান্তি চোখের চাওয়ায়।
দিন ভ'রে ওঠে স্বাদে, ভরে রাত,
তুমি কাছে নাই।
বসন্তের জানালায় মাঘের রাতের শীত
একলা পোহাই।

১৯৮. একটা নষ্ট ফল

আহা রে, তুই কে ফল অকালে
কৃপণ ডালে ফলতে গিয়েছিলি?
কেউ এখানে ফলতে আসে না রে,
খোঁজে না কেউ বেদনা নিরিবিলি।
ভিখিরিদের ভীত পায়ের ফাঁকে,
ব্যভিচারীর পাপ-মেশানো পাঁকে,
ফুলের বেলা অবহেলায় ঢাকে,
ছি-ছি ছাপায় প্রাণের ঝিলিমিলি।

তাপ-জুড়ানো ঘাটের বারাণসী,
তুই এখানে? কী দেখতে যে আসা!
কাঁকালে-সোনা-নারীতে উর্বশী?
বিশ্ব ভুলে বিধাতা ভালোবাসা?

দেহের কোষে যা এনেছিলি তার
তীর্থে ভিড়ে দলিত সমাচার
পৌঁছবে না ত্রিদিবে, সংসার
বুঝবে না সে-অভিধানের ভাষা ॥

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (জ. ১৯২৪)

১৯৯. সহোদরা

না, সে নয়। অন্য কেউ এসেছিলো। ঘুমো, তুই ঘুমো।
এখনো রয়েছে রাত্রি, রোদ্দুরের চুমো
লাগেনি শিশিরে। ওরে বোকা,
আকাশে ফোটেনি আলো, দরজায় এখনো তার টোকা
পড়েনি। টগর-বেল-গন্ধরাজ-জুঁই
সবাই ঘুমিয়ে আছে, তুই
জাগিসনে আর। তোর বরণডালার মালাগাছি
দে আমাকে, আমি জেগে আছি।
না রে মেয়ে, না রে বোকা মেয়ে,
আমি ঘুমোবো না। আমি নির্জন পথের দিকে চেয়ে
এমন জেগেছি কত রাত,
এমন অনেক ব্যথা-আকাঙ্ক্ষার দাঁত
ছিঁড়েছে আমাকে। তুই ঘুমো দেখি, শান্ত হ'য়ে ঘুমো।
শিশিরে লাগেনি তার চুমো,
বাতাসে ওঠেনি তার গান।
ওরে বোকা,
এখনও রয়েছে রাত্রি, দরজায় পড়েনি তার টোকা।

২০০. হঠাৎ শূন্যের দিকে

ক্রমে স্পষ্ট হয় সব। কে সিংহ, কুকুর, হাতি, সার্কাসের ঘোড়া;
কে টিয়া, চন্দনা, কিংবা হাঙর কুমির;

বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে এসে কলকাতার ভিড়
ঠেলে কে সাঁতার কাটে ; কে ধর্মতলায়
পাঞ্জাবির হাতা নেড়ে উড়ে যেতে চায়
হঠাৎ আকাশে। যেন একে-একে সবগুলি অভ্যাসের ফোড়া
ফেটে গেলে ঠিক
বিকেলে তিন পা হেঁটে চিনে নেওয়া যায়
কে ব্যাঘ্র, বিড়াল, হাঁস, ঝুঁটি-কাকাতুয়া ;
এবং কে শাশ্বত নাবিক।

ক্রমে স্পষ্ট হয় সব। সব-কিছু জানা গেল, এমন ধারণা
নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়ে ঘুমোনো সহজ হয়, আর
ঘুমের একটু আগে মনে হয়, দারুণ বাহার
খুলেছে রাস্তায়-ঘাটে। সবগুলি ফোড়া
ফাটিয়ে গণ্ডার, বাঘ, সার্কাসের ঘোড়া
ছুটে যায়। মনে হয়, ভিড়ের ভিতরে কেউ 'হুশ্'
ব'লে উঠেছিল ; তাই ডানা ঝাপটিয়ে
নিখিল শূন্যের দিকে উড়ে চ'লে গেল
কয়েকটি সুন্দর মানুষ।

রাম বসু (জ ১৯২৫)

২০১. আমার সেই পাখি

আমার সেই পাখি শাখায় দোল খায়
শিকড়ে ঢেউ ওঠে পাথর ভেঙে ছোটে
ক্ষিপ্র বেগ তার পাতালে মাথা কোটে
খসায় মাটি তারা হৃদয় ভেঙে যায়
শাখায় সেই পাখি যখন দোল খায়।

যখন সেই পাখি শাখায় দোল খায়
সতীকে কোলে তুলে মুগ্ধ শিব আমি
পলাশে পারিজাতে মাতাল বনভূমি
মেদুর ত্রিনয়ন জটায় মেঘ ভাঙে
মত্ত বান ডাকে চড়ায় মরা গাঙে
পৃথিবী ভালোবাসা একটা দেহ পায়
স্বপ্নে বাস্তবে অন্তহীনতায়
আমার সেই পাখি যখন দোল খায়।

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)

২০২. একটি মোরগের কাহিনী

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেলো
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়—
আরো দু-তিনটি মুরগির সঙ্গে।

আশ্রয় যদিও মিললো,
উপযুক্ত আহার মিললো না।
সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে প্রতিকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটালো সেই মোরগ,
ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত—
তবুও সহানুভূতি জানালো না সেই বড়ো শক্ত ইমারত।
তারপর শুরু হ'লো তার আঁস্তাকুড়ে আনাগোনা।

আশ্চর্য! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগলো
ফেলে-দেওয়া ভাত-রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার।

তারপর এক সময় আঁস্তাকুড়েও এলো অংশীদার
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা দু-তিনটে মানুষ ;
কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেলো বন্ধ হ'য়ে।

খাবার ! খাবার ! খানিকটা খাবার !
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বার-বার চেষ্টা করলো প্রাসাদে ঢুকতে,
প্রত্যেকবারেই তাড়া খেলো প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু ক'রে স্বপ্ন ছাখে—
প্রাসাদের ভেতর রাশি-রাশি খাবারের।

তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেলো,
একেবারে সোজা চ'লে এলো
ধবধবে শাদা দামি কাপড়ে ঢাকা খাবার-টেবিলে,
অবশ্য খাবার খেতে নয়
খাবার হিশেবে।

২০৩. হে মহাজীবন

হে মহাজীবন, আর এ-কাব্য নয়
এবার কঠিন কঠোর গদ্য আনো
পদ-লালিত্য-ঝংকার মুছে যাক,
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা, তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

২০৪. কবিতার খসড়া

আকাশে-আকাশে ধ্রুবতারায়
কারা বিদ্রোহে পথ মাড়ায়

ভরে দিগন্ত ক্রত সাড়ায়, জানে না কেউ।
উত্তমহীন মূঢ় কারায়
পুরোনো বুলির মাছি তাড়ায়
যারা, তারা নিয়ে ফেরে পাড়ায়, স্মৃতির ফেউ।

লোকনাথ ভট্টাচার্য (জ. ১৯২৭)

২০৫. প্রস্তুতি

আকাশে-আকাশে সাজ, রঙিন প্রস্তুতি :
সূর্যাস্তের মেঘ বলে, তোমাকে পাইনি তাই
গায়ে মেখে ধন্য হই, অভাবের চেতনার
সেই মহাদ্যুতি।
তোমাকে পাইনি তাই আমি গেয়ে উঠি,
যেখানে অরণ্যপথ, রাত্রি স্নেহকান্তিহীন
মায়ের সতিন ;
দেখি কি দেখি না তারা ঘনপত্রবনে—
গম্ভীর কম্পনে।
তোমাকে পাইনি তাই নিবিড় নিশীথে
প্রণয়পয়োধিজলে কার অঙ্গ-সুরভিতে
পদ্ম জাগে চিতে ;
মদালস আঁখি চায়, শূন্য ছায় কাম,
সৃষ্টির আনন্দে ওঠে তরঙ্গ উদ্দাম—
'তোমাকে পাইনি' এই নাম।

অরবিন্দ গুহ (জ. ১৯২৮)

২০৬. মূল্য

যৎসামান্য সম্বল ছিলো
তা-ও তো উড়ালি খেলায়,
নিজেকে নিয়েই ভাসলি নিজের ভেলায় ;

সে-ভেলা সইতে পারলো না তোর দুঃখের ভার,
দিঘি-পাহারায় সে-রাত্রে ছিলো যে-চৌকিদার,
সে-ও পারলো না, না কি চাইলো না উঠিয়ে আনতে
তোকে জল থেকে ডাঙার প্রান্তে।

ঘটনা হিশেবে আত্মহত্যা অতীব মুখ্য।
পরলোক ব'লে যদি কিছু থাকে
তুই যা হারালি পাবি না তো তাকে—
আর কার, বল, তোর দুঃখের তুল্য দুঃখ।

সে-দুঃখ কেউ মনে রাখলো না, সবাই ভুললো ;
বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনাহীন
লোকে বলে তোকে শুনি নিশিদিন—
কিন্তু কী ক'রে ভুলি তোর ভালোবাসার মূল্য।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (জ. ১৯৩৩)

২০৭. দেয়ালটা

বোবা দেয়ালটা শাদা দেয়ালটা
হঠাৎ লালচে,
রঙ্গনটিনী ভ্রমরার কাছে
আদর কাড়ছে।
বোবা দেয়ালটা শাদা দেয়ালটা
রঙ্গনটার পায়ে মাথা কোটে,
রঙ্গনটার পায়ের আলতা
লাগে নীরক্ত মুখে আর ঠোঁটে :

এতদিন পরে ও কিছু বলছে :
'এই যে রক্ত এই অলক্ত

আমার কঠিন পাঁজরে জ্বলছে
তার দাবি বড়ো ভীষণ শক্ত।

এই যে আমার শরীরে অধরে
স্বাক্ষর দিলি, তোর পায়ে প'ড়ে
ভেঙে যাই যদি, তবু বল ওরে
ভ্রমরা, পালিয়ে যেতে পারবি তো ?'

আমি তো পঙ্গু, নিশ্চল, বোবা,
আমি যদি হই তোর মনোনীত
কোন করবীতে আমি তোর খোঁপা

সাজিয়ে করবো আরো মনোলোভা—
বঁধুয়া, তখন তুই কার মিতা ?
ভ্রমরা তবুও তুই নিশ্চুপ, তবু চিত্রার্পিতা।

২০৮. একটি কথার মৃত্যুবার্ষিকীতে

তুমি যে বলেছিলে গোধূলি হ'লে
সহজ হবে তুমি আমার মতো,
নৌকো হবে সব পথের কাঁটা,
কীর্তিনাশা পথে নমিতা নদী !
গোধূলি হ'লো।

তুমি যে বলেছিলে রাত্রি হ'লে
মুখোশ খুলে দেবে বিভোর বিভা,
অহংকার ভুলে অরুন্ধতী
বশিষ্ঠের কোলে মূর্ছা যাবে !
রাত্রি হ'লো।

প্রথম পংক্তির সূচি